প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশিকা
শ্রীমতী চিত্রা সেন
১৬০ এবি ব্লক, সল্টলেক কলিকাতা ৭০০০৬৪

প্রচ্ছদ
শ্রীঅনুপরায়

মুদ্রাকর
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ধর—এম্ এ।
অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সম্পাদক "যুগান্তর" ও
সম্পাদক "বসুমতী"।
যাঁকে কথায় ও কাজে অসাম্প্রদায়িক দেখেছি

ভূমিকা

'অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্তমান কালে পশ্চিমমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া।...সে দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আর-এক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কান-মলার কাজে তিনি প্রস্তুত।'

আমাদের দেশের দুই পক্ষ অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের নিজস্ব ঘরোয়া বিবাদ-বিসংবাদ ক্ষোভ-মতান্তরের বিরোধ-সংঘাতের 'দুঃখের বাসরঘরে' ব্যঙ্গপ্রিয় তৃতীয় পক্ষ অথবা তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী, অট্টহাস্য ও কান-মলার কাজে যে প্রস্তুত, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা প্রায় পঁচাত্তর বৎসর আগের (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) একটি প্রবন্ধে সুচিহ্নিত করেছিলেন। 'ছোটো ও বড়ো' নামের সেই লেখাটির সঙ্গে জিজ্ঞাসু পাঠকেরা অনেকেই পরিচিত।

তবে কি সাম্প্রদায়িকতা এ দেশে পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দেরই আমদানি? প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে কি এ দেশে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিরোধ সংঘর্ষ আদৌ ছিল না? না। সে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে, ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থে আমাদের দেশের এই ধরনের অন্তর্নিহিত বিভাজন-প্রবণতাকে যথেচ্ছ কাজে লাগিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের চৌষট্টি বৎসর আগেই অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মের আট বৎসর আগে লেখা 'দ্য ফিউচার রেজাল্টস অব

দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে স্বয়ং কার্ল মার্কস আরো কয়েকটি পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েই তো লিখেছিলেন, এমন একটা শতধাবিচ্ছিন্ন ও দ্বন্দ্বসংঘাতমুখর দেশ বিজিত হওয়ার অপেক্ষাতেই যেন ছিল—'A country not only divided between Mohammedan and Hindoo, but between tribe and tribe, between caste and caste, a society whose framework was based on a sort of equilibrium, resulting from a general repulsion and constitutional exclusiveness between all its members. Such a country and such a society, were they not the predestined prey of conquest ?'

অর্থাৎ সমকালীন খণ্ডছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিজিত হওয়ার অপেক্ষাতেই যেন প্রায় ছিল। অনেক পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরুর একটি চিঠিতেও আমরা সমকালীন ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে একই মূল্যায়ন পেয়েছিলাম—'কোথাও কেউ বলবেন না যে, ভারতে বিভাজনের অন্তর্নিহিত প্রবণতা আগে থেকেই ছিল না। রাজনৈতিক শক্তিলাভের সম্ভাবনার ফলে এই প্রবণতা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল। সে সময় এমন পলিসি নেওয়া যেতে পারত যাতে এই প্রবণতাগুলি কমে আসে, আবার এমন নীতিও নেওয়া যেতে পারত যাতে প্রবণতাগুলি ভীষণরকম বেড়ে যায়। সরকার দ্বিতীয় পন্থাটিই বেছে নিয়েছিল এবং সর্বতোভাবে ঐক্য ও সংহতি-নাশকারী প্রবণতাগুলিকে উৎসাহ ও প্ররোচনা জুগিয়েছে।'

বিভেদবিচ্ছিন্নতা তথা অনৈক্য ভারতবর্ষে আদৌ ছিল না এবং ব্রিটিশ শাসকেরাই এদেশে তার গোড়াপত্তন করেছিল, এ কথা কোনো ইতিহাস-সচেতন মানুষই বলবেন না, কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসকেরা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এখানে উপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজটিকে মহীরুহে পরিণত করার লক্ষ্যে ভয়াবহ মাত্রায় তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, যার চরম কুৎসিত প্রকাশ বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার

মাধ্যমে লক্ষণীয় হয়েছে এবং অবশেষে দেশভাগের সর্বনাশা পরিণামকে সুনিশ্চিত করেছে। উনিশ শতকের ব্রিটিশ ভারতে যে-কৌশলের সূচনা, চলতি শতাব্দীর প্রথম থেকেই তার নির্লজ্জ নগ্নরূপ প্রকট। যে-কোনো রকম সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের অপচেষ্টাই সেই কৌশল। এ ক্ষেত্রে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী লেখকেরাই ইন্ধন জুগিয়েছেন, তাই নয়, হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদের প্রবক্তারাও তাঁদের রচনায় একই প্ররোচনাসৃষ্টিতে লজ্জাহীন তৎপরতায় প্রমত্ত হয়েছেন—'ক্রমে বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় গ্রুপগুলির স্ট্র্যাটেজি, নানাধরনের মিথ, প্রতীক এবং কিংবদন্তী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বড়ো হাতিয়ার হয়ে উঠলো, সমান্তরালভাবে তার সহায়ক হলো বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠন,' লিখেছেন সুপরিচিত ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর 'আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতা' নামের গ্রন্থে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ও পাকিস্তানে মৌলবাদী বুদ্ধিজীবীদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চার নিদর্শন বড়োই ভয়াবহ। ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী ইতিহাসচর্চায় প্রবৃত্ত নবীন-প্রবীণ ইতিহাসবিদ্‌গণ সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন, 'দুই সম্প্রদায়কে দুই মেরুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অস্ত্র হলো অতীতের পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা—টু সি পাস্ট উইথ প্রেজুডিস'। সদ্যতম রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের বিরোধ-বিসংবাদ-প্রসঙ্গেও তা লক্ষণীয়।

বস্তুত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির নগ্ন ও নিকৃষ্ট নিদর্শনের মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে বিব্রত বিবর্ণ ও হতবাক হয়ে যেতে হয়। এর বিরুদ্ধে শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংহতির সাধনা এক দুশ্চর তপস্যার মতোই প্রতিভাত হয়। অদূর অতীতের কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর একটি সাংবাদিক-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা করা যেতে পারে :

স্থান : জব্বলপুর। কাল : ১৯১৯।

উষা ভার্গব নামে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করায় দু'টি মুসলমান

ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঊষাকে ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে। ধর্ষণের অভিযোগে নয়। ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে। এই ঘটনার স্ফুলিঙ্গ দাঙ্গার দাবানলে পরিণত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। দেশের বৃহৎ সংবাদ-পত্রগুলিতে এ সমস্তই পাকিস্তানী দালালদের চক্রান্তরূপে বর্ণিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে বৃহৎ সংবাদপত্র-গুলিতে প্রকাশিত এই সব প্রতিবেদন। একটি মসজিদ থেকে গোপন ট্রান্সমিটার যোগে পাকিস্তানই এই সব কাণ্ডকারখানা ঘটায় বলে অভিযোগ ওঠে। বহুসংখ্যক মানুষকে, প্রধানত মুসলমানদের দাঙ্গার বলি হতে হয়। একটি ক্ষেত্রে নারী ও শিশুসহ পঁচিশজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

অধিকাংশ সংবাদপত্রেই একই রকম প্রতিবেদন ছাপা হয়। বলাই বাহুল্য, সংবাদের উৎস অর্থাৎ সূত্র ছিল অভিন্ন।

'জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সংবাদপত্রের ভূমিকা' শিরোনামে (বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত) একটি সেমিনারে (ডিসেম্বর, ১৯১৯) পঠিত এবং আসগর আলি এঞ্জিনীয়ার সম্পাদিত 'কমিউনাল রায়ট্‌স্ ইন পোস্ট-ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া' সংকলনে প্রকাশিত (প্রথম সংস্করণ ১৯১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৯) নিবন্ধটিতে ১৯১৯ সালের জব্বলপুরের দাঙ্গা প্রসঙ্গে এই বৃত্তান্ত জানিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এস বি কলপে।

বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে এই সব প্রতিবেদন দেখে কলপে তাঁর সম্পাদকের সম্মতি নিয়ে জব্বলপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি বৃহৎ সংবাদপত্রের পক্ষে মাত্র দু'-তিনজন (অপরিচিত) ব্যক্তিকে রিপোর্টারের ভূমিকায় দেখতে পান তিনি এবং বুঝতে পারেন, দেশব্যাপী রাজনীতিতে সর্বনাশা ঝড় তুলেছে যে সব প্রতিবেদন, সেগুলির স্রষ্টা কারা। ঐ জনাতিনেকের একজনই মাত্র ছিলেন কাজচলা গোছের ইংরেজি রিপোর্ট লিখতে কোনোমতে সমর্থ এবং অবশিষ্ট দু'জন প্রথম জনের রিপোর্টটাই কিছু অদলবদল করে কার্যত টুকে রিপোর্টিঙের কাজ চালাচ্ছিলেন।

প্রায় কিছুই জানা যায় নি, তা-ও আমাদের তথাকথিত স্বাধীন সাংবাদিকতার দৌলতে।

লক্ষণীয় যে, এই দাঙ্গায় যে সব বিড়ি তৈরির ফ্যাক্টরি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি প্রায় সবই মুসলিমদের। স্থানীয় একজন কলেজ-অধ্যাপক অনুসন্ধানী সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন আরো একটি গূঢ় সমাচার: 'একটি উদীয়মান হিন্দু শিল্পপতি-পরিবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য নানাভাবে টাকা ছড়াচ্ছে, এই পরিবারটি দেশের প্রায় সবগুলি বৃহৎ জাতীয় দলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ, সর্বাধিক অন্তরঙ্গ দেশের শাসকদল কংগ্রেসের সঙ্গে।'—সামান্য একটু তলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলির নেপথ্য-সূত্র হিসাবে থেকে যায় অর্থ-নৈতিক ধান্দাবাজি। সংশ্লিষ্ট লেখক-সাংবাদিক প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, ঘটনার সত্য বিবরণ তুলে ধরতে তাঁকে কী পরিমাণ মেহনত করতে হয়েছিল, কী ভাবে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল এবং তাঁরই ভাষায়—'স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমাকে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল এবং জব্বলপুরের কংগ্রেসী লোকসভা-সদস্য শেঠ গোবিন্দ দাসকে আমি দাঙ্গা-সংক্রান্ত সত্য ঘটনাবলী সারা দেশের কাছে সযত্নে গোপন রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলাম।'

তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী নেহরু। তিনি জব্বলপুরের দাঙ্গায় বিচলিত বোধ করেছিলেন, কেননা, সেই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় সঠিক-ভাবেই সারা দেশের মানুষের মনে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভাবকে তীব্রতর করে তুলেছিল। তিনি কিছু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই ১৯৬২ থেকে এই ১৯৯২, বিগত তিন দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পাশাপাশি দারুণতর বিচ্ছিন্নতাবাদী কাণ্ডকারখানা প্রমাণ করছে কেন্দ্রের শাসকদলের সর্বাত্মক ব্যর্থতা।

দেশভাগের মূল্যে মানুষ যে-স্বাধীনতা পেয়েছিল, তা যে কত ঠুনকো এবং দেশের শাসকদল যে এই দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় কত অক্ষম, জব্বলপুরের দাঙ্গা একদিকে যেমন তা প্রমাণ

করেছিল, তেমনি পাশাপাশি মানুষের মনে তখনই এই সংশয় সৃষ্টি করেছিল যে, শেঠ গোবিন্দদাসদের ভিড়ে সমাচ্ছন্ন কেন্দ্রের শাসকদলই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচ্ছন্নভাবে মদত জোগায়।

আর, জব্বলপুরের দাঙ্গা-সৃষ্টিকারীরা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছিল যে, মুসলিম মৌলবাদীদের পাল্টা হিন্দু মৌলবাদীরা সংগঠিত-ভাবে আরো তীব্র দানবিক ভূমিকায় সক্রিয়।

জাতীয় সংহতির শ্লোগান বা পোস্টারই জাতীয় সংহতি-চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিরোধ করতে হবে রাজনৈতিকভাবেই, অর্থনৈতিক বৈষম্যকে জীইয়ে রেখে সে-কাজ সাধনও অসাধ্য। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, কংগ্রেসের একজাতিতত্ত্ব এবং মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব, কোনোটাই সঠিক নয়। এই 'নানা ভাষা নানা বেশ নানা পরিধানে'র দেশে ভাষা-সংস্কৃতিগত যে বৈচিত্র্য, তার প্রত্যেকটিকেই বিকাশের সুষ্ঠু পথ করে দিতে হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান সম্ভবপর।

আধুনিক ভারতবর্ষে যিনি 'মানুষের ধর্মে'র প্রবক্তা, সেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় চুরাশি বৎসর আগেই যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, "সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ···। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে? এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান?"

এই প্রশ্নটিই কি উত্তরগর্ভ নয়?

'সভ্যতার সঙ্কট' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বুর্জোয়া সভ্যতা তথা পুঁজিবাদ যে সেই সঙ্কটের জনক, তা নিঃশেষে বুঝতে তাঁরই লেগে গিয়েছিল সারাটা জীবন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট', তাতেই স্পষ্টভাষায় জানালেন, ইংরেজ পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। পক্ষান্তরে, একই প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা উচ্চারণ করলেন, 'মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের

একটি অসাধারণতা আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলাম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ-সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।

পুনশ্চ, 'সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই সব জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি।'

পরবর্তীকালে সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন্ স্খলন থেকে কী ভাবে কোন্ পতন ঘটলো, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত বিশেষজ্ঞরা আছেন, আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে এইটুকুই প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারি : সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা-বাদের বিরুদ্ধে তীব্রতর ধারাবাহিক সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ও চেতনার প্রয়োগ অপরিহার্য, কেননা গণতন্ত্রের রক্ষার গ্যারান্টি সেখানেই এবং জাতীয় সংহতির সাধনা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বৈষম্য নির্মূল করার লক্ষ্যে পৌঁছনোর সাধনারই নামান্তর। সেটা আকাশ থেকে পড়বে, এমন অদ্ভুত কোনো বস্তু নয়।

তবু, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট নন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংহতির সাধনাই তাঁদের কাজ। কল্যাণ সুন্দরম্ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বাংলাসাহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ' (১৯৮৮) লিখে এই প্রত্যয় অন্তত সহৃদয় পাঠকদের মনে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন যে, 'তাঁর দেখবার ভঙ্গিতে যে ইতিহাসবোধ ও জীবনবোধ ফুটে উঠেছে, তা নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।...আমি তাঁকে সমালোচক না বলে একজন পরিশ্রমী পাঠক হিসেবেই বিচার করতে বলবো। তিনি ক্ষুরধার পথে সাহিত্য পরিক্রমা করেছেন।...সমালোচনার জগতে ভাববাদী কুয়াশা ঠেলে এগোতে চেয়েছেন তিনি। সাহিত্য ও

সাহিত্যিকের সামাজিক দায়টা কী এবং কোথায়, তা তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। এ হলো দেখার চোখ ও বিচারের মনোভঙ্গি। এই দুইয়ের সমাহারে তৈরি হয়েছে এই গ্রন্থ।'—কবি-সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর লেখকের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি করেছিলেন।

বস্তুত, কল্যাণ সুন্দরম্ তাঁর এই দ্বিতীয় গ্রন্থে 'অসাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে' যাত্রা করেছেন একই গভীর নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতায়। এক অর্থে হয়তো বলা যায়, 'বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ' যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে এই নতুন বইটি। অর্থাৎ গ্রন্থদুটিকে একই সাধারণ চেতনাসূত্রে গ্রথিত করা যায়। চর্যাগীতির এবং মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন, সেখানে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের বক্তব্য, 'সেকালে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা থাকলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল অনাবিল'।

অতঃপর লেখক 'সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ' বুঝিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'শব্দব্যবহারে, আহার্যগ্রহণে এবং বিবাহব্যবস্থায়—এই তিনটি মাধ্যমকে ধর্মীয় নেতারা এমন সুনিশ্চিতভাবে ব্যবহার করেছেন যে, মানুষ জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত আত্মনিবেদিত এবং নিগড়বদ্ধ জীব হয়ে পড়েছে।'—পরবর্তী অধ্যায় তিনটিতে কল্যাণসুন্দরম্ অসাম্প্রদায়িকতা পরিপোষণে প্রচলিত শব্দব্যবহার, আহার্যগ্রহণ ও বিবাহব্যবস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন। এই বিশ্লেষণ ও ভাষ্য রচনায় স্বভাবতই লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত প্রণোদনাও কাজ করেছে। অধ্যায়তিনটির মাধ্যমে পাঠকসাধারণের বড়ো একটি অংশের সচেতন হয়ে ওঠার মতো উপাদান যথেষ্টই আছে। পরবর্তী অধ্যায় 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মসংঘ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' বিশেষভাবে বিতর্কিত প্রবন্ধরূপেই প্রতিভাত হতে পারে। বস্তুত, সব সময়ে সব প্রশ্নের উত্তরদানেই প্রাবন্ধিকের সাফল্য নির্ভরশীল নয়, সচেতন পাঠকের

চিত্তে নতুন নতুন প্রশ্নের অবতারণাও লেখকের সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন। এই প্রবন্ধটি প্রসঙ্গেও সে কথা প্রযোজ্য। তাতেও প্রাবন্ধিকের সন্ধানের আন্তরিকতা অপ্রমাণিত হয় না।

কল্যাণ সুন্দরম্ সমাজ-সাহিত্য-স্বদেশ ও স্বজাতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবেন, আন্তর্জাতিক চেতনার পটভূমিতেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে চান এবং সর্বোপরি পাঠকদের ভাবাতে চান : এখানেই তাঁর যাবতীয় সন্ধানের সততা ও সামর্থ্য প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। সাংবাদিকতা
ডীন, ফ্যাকাল্টি অব
এডুকেশন, জার্নালিজম অ্যাণ্ড লাইব্রেরী সায়েন্স
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-সৌধের ভিত্তি রচিত হয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর। একারণেই "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড" শব্দ যুগল বস্তুবাদী শিবিরে প্রবাদ প্রতিমতা লাভ করেছে। তথাপি, সমকালের ভারতবর্ষীয় সমাজের সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার মধ্যে কোনটি আশু সমাধানের দাবী রাখে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, বস্তুবাদীকেও ক্ষণকালের জন্য হলেও ভাবতে হবে বৈকি। দুটির কোনটিই নয় চিরকালের সমস্যা। যাদের প্রয়োজনে এ সমস্যার উদ্ভব, তারা চাইবে এই সমস্যা দুটিকে তীব্র সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়ে সংঘর্ষের রূপ দিতে। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

জনগণের নিরাপত্তা, শান্তি কিংবা সমাজ প্রগতির কথা বলছি না। এসব তো আছেই। বলছি আমাদের দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার কথা ভেবে। এদেশে আমরা জন্মেছি। এদেশেই আমরা বাঁচতে চাই। এদেশকে আমরা ভালোবেসেছি। এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে। সেই 'মুগ্ধ নয়নেই' আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেশ-বিভাগ। তাঁর মর্মন্তুদ চিত্র স্মৃতিমাত্র নয়। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। বহুতা সমাজের আকস্মিক অবসন্ন একটি অধ্যায়ের ইতিহাস সেই দিনগুলি। আমরা চাই সেই অভিজ্ঞতার শরিক আর কাউকে যেন না হতে হয়।

তথাপি, সেই অবসন্ন অধ্যায়ের স্মৃতি যেন ফিরে আসছে। দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আজ ভয়াবহ। দুঃস্বপ্নের স্মৃতিমাত্র নয়। এই সমস্যা আমাদের ভাবায়। কেন এই সমস্যা? এই প্রশ্ন থেকে এ পুস্তক রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল এবং অমিল দুটো দিক থেকেই এই সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায়—হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মিল-অমিল যা কিছু আছে তার আলোচনা করা হয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের অমিলের আলোচনায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাইনি। এই মিল এবং অমিল জেনে এবং মেনে নিয়েই একটি সমন্বয়ের পথ পেতে হবে। সেই কথাটা স্পষ্ট হলেই এরই প্রকাশের সার্থকতা।

এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ 'গণশক্তি' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই সুযোগে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। তিনবছর পূর্বে আমার প্রথম পুস্তক "বাংলাসাহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ" প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক প্রকাশের পর পরিচিত হই ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের সঙ্গে। তিনি এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। নানাভাবে আমাকে সাহিত্য রচনায় সহায়তা করেছেন। সাহায্য পেয়েছি আমাদের সংগঠনের সভাপতি শ্রীহিমাংশু রায়ের কাছে থেকেও। প্রীতিমধুর এই সম্পর্ক ধন্যবাদের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

পুস্তক প্রকাশের নেপথ্যে থাকে অনেকের সাহায্য এবং উৎসাহ। বিশেষ করে প্রচার কাজে এই সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন এবং করছেন সর্বশ্রী নিতাই জানা, দেবী প্রসাদ জানা, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি ভূষণ নন্দ এবং পুস্তক বিপণির অনুপ মাহিন্দার। এদের সাহায্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। এ বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রীঅনুপ রায়। তিনিও কোন রূপ প্রতিদান প্রত্যাশা করেন নি এবং নেন নি। তাই তাকেও ধন্যবাদ দেব না। কুমারী অদিতি দাশ গুপ্তা নির্ঘন্ট প্রস্তুত করে আমার শ্রম লাঘব করেছে। এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রথম বইয়ের সকল সমালোচককে। তাদের মন্তব্য আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। প্রত্যাশা এই যে, এ বইটিও তাদের মনোযোগ পাবে।

এই পুস্তকের দুটি প্রবন্ধ দেখে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন রবীন্দ্র ও আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উর্দু সাহিত্যিক শ্রীশান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিমেয়। সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার অবদান তুচ্ছ। এঁদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই আমার পাথেয়।

কল্যাণ সুন্দরম্

অসাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

প্রাণ জেগে উঠে নিত্য নতুন ছন্দে। প্রভাত পাখির কলতানে। নদী আর বনস্পতির ঐকতানে। প্রজাপতির রংবাহারে। সূর্যের দীপ্ত তেজে। চন্দ্রালোকিত নিশুতি রাতের নীরবতায়। মনের আনন্দ, দেহের তৃপ্তি উষসী আলোর স্পর্শে, প্রজাপতির উড়ে চলার মত ছড়িয়ে পড়ে প্রান্তরে প্রান্তরে। বনের মর্মর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয় আমারই আনন্দ। এই আমি চিরদিনের মানুষ। তাবৎ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের যোগে পূর্ণ হয় ঐকতান। সমবেত মানব-কণ্ঠ একই সঙ্গে উচ্চারণ করে, বন্ধন নয় মুক্তি চাই। আমার বা আমার সম্প্রদায়ের জন্য নয়—সকলের জন্য। সকলে এভাবে ভাবে না। ভাবলে মনের ভার চিরতরে লাঘব করা যেত।

কেউ কেউ বলেন, আমাকে মান্য কর। ভয় হয় তখনি। প্রয়োজনে এই আমি আমরা হয় কিন্তু আমরা মানে কখনোই নয় সকলে। কোন কোন সময় এই আমি এবং আমরা রুদ্র মূর্তি ধারণ করি। তখনি আসে সাম্প্রদায়িকতা নানা ভাবে, নানা রূপে তার প্রকাশ। তাই খেলার মাঠে দাঙ্গা হয়। রাজনৈতিক দলাদলিতে প্রাণহানি হয়। প্রায়ই দেখা যায় খেলার মাঠে যারা বিরোধী দুই দলের সমর্থক, রাজনীতিতে তারা একই দলের সদস্য। এর বিপরীতটাও ঘটে। বর্ণ, অঞ্চল ইত্যাদি থেকে সম্প্রদায় বিভাজন দেখা যায়। কিন্তু ধর্মের দ্বারা বিভাজিত সাম্প্রদায়িক জনমণ্ডলীর সম্প্রদায় চেতনা স্থায়ী রূপ নেয় কেন? চিরদিন কী এমন ছিল?

নৃতাত্ত্বিকগণ বাঙালীর উদ্ভব ও বিকাশের কথা বলেছেন। তাঁদের সহমত পোষণ করতে দেখা যায় কদাচিৎ। উৎসে আর্যেতর চারটি মূল ধারা সকলে মেনে নিয়েছেন। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোটচীনীয়। এরা কেমন করে পাশাপাশি বসবাস করত, সেই ইতিহাস সহজলভ্য নয়। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছিল কিনা তাও

জানা যায় না। বাঙালীর ইতিহাস সহজলভ্য নয়। শশাঙ্কের গৌড়ে, সংঘাত ছিল। নাহলে এদের পরই প্রায় এক শত বৎসর মাৎস্যন্যায় চলে? একালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে সেই অরাজকতার তুলনা ঠিক হবে না। একালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রী। সেকালের অরাজকতা ছিল রাজনৈতিক শূন্যতা থেকে। পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ। তাদের পর এলেন সেন রাজারা। তারা ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এই দুই মতের মধ্যে একটা সংঘাত কল্পনা করা যায়। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ছড়াটি হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ এবং বিদ্বেষের কথাই বলে। কিন্তু এই বিরোধের কোন ইতিহাস নেই। লামা তারানাথের মতে, বৌদ্ধগণ নাকি তুর্কী নায়ক ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বখ্‌তিয়ার খিলজীর হয়ে গুপ্তচরের কাজ করেছিল।

বাঙালীকে ইতিহাস জানতে হলে, সাহিত্যের সাহায্য অপরিহার্য। সাহিত্য তা কাব্য, নাটক কিংবা প্রবন্ধ যাই হোক যুগচিত্র তাতে থাকবেই, কম কিংবা বেশী। বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় কবিতার মাধ্যমে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেন কিছু কবিতা। সংখ্যায় তা অর্ধশত। চর্যাপদের ভাষা 'সন্ধা' কিংবা 'সন্ধ্যা' যাই হোক পুঁথিটি 'চর্যাপদ' নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। বিতর্ক আছে নাম নিয়ে। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়,' 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কিংবা 'চর্যাগীতিকোষ' এই তিনটি নাম পণ্ডিত মহলে পরিচিত।

এই মতটিও এখন মান্য যে, চর্যার পদে আছে একাধিক অর্থ। চর্যাপদকারগণ ছিলেন ধর্ম পথের পথিক। তারা তাঁদের ধর্মকথা বলেছেন চর্যাপদে। সেটা তাঁরা গোপন রাখতে চেয়েছেন। ফলে চর্যাপদে লোকায়ত এবং ধর্মীয় এই দুটি করে অর্থ আছে। স্থূল বা প্রচলিত শব্দার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতীককল্প কিংবা আভিপ্রায়িক অর্থ। যেটা শুধুমাত্র দীক্ষিতের জন্যই ব্যবহৃত। তাই বলে চর্যার সাধারণ বা লোকায়ত অর্থটি কিন্তু অবহেলার নয়। সাধারণ মানুষের

কাছে এই প্রচলিত কিংবা লোকায়ত অর্থটিই প্রিয়। এটি তারা মনে রেখেছেন। তা না হলে, 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' চরণটি প্রবাদ-প্রতিমতা পেত না। অথবা একালের যুবজনতার আবেগ প্রকাশের উৎস হতো না চর্যার এই চরণ দুটি :—

"এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বি আপক বক্ষেণ তোড়িউ।"

সমকালের বাংলায় এর রূপ হবে এই রকম—

আমি ভেঙ্গেছি বাধার তোরণ
যত শৃঙ্খল বাধা করেছি হরণ।

চর্যাকার কোন গুপ্ত সাধন-কথা প্রকাশ করেছেন এই চরণদ্বয়ে জানি না। কিন্তু একালের যুবকের অসাম্প্রদায়িক, বিদ্রোহী এবং মুক্ত মনের প্রতিফলন হয়েছে এতে। চর্যার সাধক কবি চায় নির্বাণ বা মহাসুখ। এজন্য তাকে জানতে হয় শূন্য, করুণা এবং মহাসুখের ধারণার অর্থ। এই যে ধর্মকথা এই প্রসঙ্গে চর্যাকার আবার ধর্মাচারের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। সেই স্থানটিতে তিনি ব্যক্তি মানুষ তো বটেই, সেই সঙ্গে তামাম মনুষ্য সমাজেরও একজন। এই উপলব্ধির কথাটিই আমরা জানতে চাই। যেখানে চর্যাকার অতিক্রম করেন ধর্মাচারের গণ্ডী, ভাঙ্গন সংস্কারের বাধা এবং দেখান মুক্ত জীবনের পথ।

চর্যাকারগণ বৌদ্ধধর্ম মতের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বৌদ্ধদের পঞ্চমূঢ়তা তো প্রচলিত সংস্কার ভাঙ্গারই আহ্বান। এই চিন্তার প্রতিধ্বনি পাই একটি কবিতার মধ্যে, "বেদ পড়ে মুক্তি নাই। মুক্তি হবে না যজ্ঞের ধোঁয়া লাগিয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেও। মুক্তি আসবে না গুরু কিংবা ক্ষপনকের নির্দেশে।" কবি এখানে সম্প্রদায় নির্ভরতা অতিক্রম করে চিত্ত মুক্তির কথা বলেছেন মুক্তচিত্তে। সেকালের গণ্ডীবদ্ধ সমাজজীবনে এই গুরুবাদ বিরোধিতা বেশ সাহসী পদক্ষেপ। এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অন্য কবির কণ্ঠে শুনি—

"জাহের বাণ, চিহ্ন রূপ না জাণী
সো কইসে আগম বেএঁ বখানী ॥"

অর্থাৎ 'যার চিহ্ন, বর্ণ এবং রূপই জানা যায় না তিনি আগম আর বেদ তত্ত্ব কী করে ব্যাখ্যা করবেন ? কবির সোজা কথা, 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ'। আপনি বুঝে লও আপনাকে নিজের চিন্তার দ্বারা। প্রচলিত আচার এবং সিদ্ধরস বিরোধী বক্তব্য রাখা একালেও সহজ নয়, সেকালে ত সহজ ছিলই না। তাই চর্যাপদ সমকালেও প্রাসঙ্গিক।

কোন কোন চর্যার চরণ তো কেবলমাত্র ভাবায় না, তা উদ্বুদ্ধও করে আমাদের। 'জেতই বোলী তেতবি টাল।' (যতই চলি ততই যে ভুল হয়) চর্যাপদকারের ঐ ভুল শব্দটি 'নতুন' বলতে পারলে সকল ধন্দ নিরসন হত। যদিও 'ভুল' অর্থে এখানে 'নতুন' কিছু দেখার কথাই বলা হয়েছে। যদি এই কথাটা মেনে নেওয়া যেত যে, কিছুই স্থায়ী নয়, সবই হয়ে উঠছে এবং পরিবর্তন প্রকৃতিরই অন্তরধর্ম বা গুণ তাহলেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হওয়া যেত। কিন্তু ভাববাদীদের 'স্থায়ী' বা 'আদর্শ' জগতের অপরিবর্তনীয়তার বিশ্বাস থেকে জনগণ সেই সময় মুক্ত হতে পারেনি। চর্যায় এসকল প্রত্যাশা করা অর্থহীন। যেটা তাক লাগিয়ে দেয় তাহলো একালের চিন্তার যেন একটা আভাস পাওয়া যায়। আর তা একেবারেই কষ্টকল্পিত নয়।

অন্য তুটি দিক থেকেও চর্যায় একটা অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ লক্ষ্য করা যায়। মানব জীবনে প্রেমের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মকেন্দ্রী চিন্তার এই দিকটা গুরুত্ব পায় না। চর্যাপদে কিন্তু প্রেমের মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। কল্পিত জীবনের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। কাহ্নপাদ ডোম্বীকে বিবাহ করেছেন। শবর-শবরীর তুঃখ জয়ে তাদের মিলিত জীবনের সংগ্রাম জয়গানে মুখর। পঞ্চদশ সংখ্যক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

উচ্চবর্ণের মানুষের প্রতি তির্যক মনোভাব প্রকাশ চর্যাপদের আর

একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও পদকারগণ অনেকেই ছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণ সম্ভূত। এঁরাও কিন্তু ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিভূ রূপেই দেখেছেন—সমগ্র মানব সমাজের প্রতিভূ রূপে নয়। 'ব্রাহ্মণ নাড়িয়া' (নেড়া ব্রাহ্মণ) শব্দটির ব্যবহারে এই মনোভাবই প্রতিফলিত। এই কবি আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন না। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-মুক্ত। 'বলদ বিয়াইল' কিংবা 'নাই বন্ধ্যা' প্রভৃতি শব্দের ধর্মাচারসম্মত অর্থ নিশ্চয় আছে। কিন্তু একালে আমরা এই সকল শব্দের মাধ্যমে নিখিল বিশ্বের নিঃস্ব মানুষের অসহায়তাই ফুটে উঠেছে বলে মনে করি।

'হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জানী' চরণের চলতি অর্থ হলো,—হরিণ হরিণীর বাসস্থান চেনে না। এই চরণের ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে। বাস্তব জীবনে এর প্রতিক্রিয়া অন্যমাত্রায় যুক্ত। শিকারী হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। হরিণ আশ্রয় খোঁজে। তখন পথ দেখায় ঐ নিলয় না-মানা হরিণী। চলতি সময়ে এই চরণের প্রাসঙ্গিকতা দূরন্ত। আত্মরক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে রক্ষায় দ্বিধা কিংবা প্রশ্ন নয়। এগিয়ে চলো।

সাতচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় বলা হয়েছে, হরি-হর-ব্রহ্মা, এই ত্রয়ী আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। সেই আগুনে ধোঁয়া নেই। অনুপস্থিত শিখা। এ কবিতার ধর্মীয় ব্যাখ্যা গুহ্য। তাই থাক। আমরা মনে করি সম্প্রদায় ভাঙ্গার উল্লাস এখানেও অলভ্য নয়।

অসাম্প্রদায়িক চিন্তার অন্যতম লক্ষণ হলো, সাম্প্রদায়িক প্রীতি-হীন কোন শব্দই যেন ব্যবহৃত না হয়। থাকবে মুক্ত চিন্তা এবং সার্থক শ্রেণীচরিত্র। চর্যাপদ রচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে সমাজের সর্বশ্রেণী কিংবা বর্গের মানুষ আছেন। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ করেছেন শোষিত মানুষের জীবনকথা। ব্যবহৃত প্রতীক চিত্রকল্পে এসেছে শোষিত শ্রেণীর অনুষঙ্গ। বলতে পারা যায়, মাহুত, কাপালিক, শবর, ব্যাধ প্রভৃতি এই শ্রেণীর শব্দ। তুলোধোনা, বয়ন-কৌশল এবং নৌকার

উল্লেখ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক, চর্যাপদকর্তারা তাদের শ্রেণী, বর্ণ বা ধর্মের কোন পরিচয় রাখেননি তাদের নামের মাধ্যমে। প্রায় সকল কবিই নামের শেষে 'পা' ব্যবহার করেছেন। যেমন— ডোম্বীপা, শবরপা, বীণাপা, তাণ্ডিপা, কাণ্ডপা, সোলিপা, কুক্কুরিপা, মেদিনীপা, বহুলপা কিংবা কুমরীপা ইত্যাদি। বাঙালী সমাজে এ একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। তারা কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেকথা স্পষ্ট নয়। শব্দ ব্যবহারেও তাঁরা ছিলেন মুক্তমনা। এখন বাঙালী হিন্দু 'জল' এবং বাঙালী মুসলমান 'পানি' বলে একই বস্তুকে। চর্যায় দুটো শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। বিবেচনায় আনা হয়েছে ধ্বনি প্রাসঙ্গিকতা। দেখা যাচ্ছে চর্যাপদে অসাম্প্রদায়িক চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে।

১২০৩ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক থেকে ইংরেজ বিজয়ের (১৭৫৭) পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা ছিল মুসলমানদের অধীন। এই সময় তিনটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় বাঙলায় দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না একথা বলা যাবে না। কোন কোন মুসলিম শাসক তো বেশ অত্যাচারী ছিলেন। হাবসীদের শাসন তো দুঃস্বপ্নের ইতিহাস। বৌদ্ধদের হিন্দু বিদ্বেষের কথা পূর্বেই বলেছি। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী সম্প্রদায়ের সাহিত্য। অন্যদিক থেকে এই সাহিত্য একটা অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করেছে। তাহলো, এই সকল পদাবলী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিগণই রচনা করেছেন। মৃজা হুসেন আলী রচিত শাক্ত পদাবলীর কয়েকটি চরণ এইরকম—

"আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বাস করি।
বলে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।"

একালের সমাজে এই উদারতা প্রত্যাশার বাইরে। ধর্মীয় পরিচয় যদি মানুষের শেষ কথা হতো তবে নসির মামুদ লিখতে পারতেন না,—

'আগম-নিগম-বেদ-সার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি ॥'

এই ধরনের পদ রচনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটা সেসময়ের সমাজের একটা স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি। শম্‌সুদ্‌দীন ইলিয়াস শাহ'র সুলতান পদ লাভের সময় থেকে এই মিলনের প্রয়াসটি ছিল প্রকৃতই সক্রিয়। কৃত্তিবাস ওঝা কোন গৌড়েশ্বরের রাজদরবারে গিয়ে পুষ্পমাল্য এবং পাটের পাছড়া পেয়েছিলেন তা ঠিক ঠিক জানা যায় না। কিন্তু বাংলায় কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে প্রথম যিনি কাব্য রচনা করেন সেই মালাধর বসু ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁকে 'গুণরাজখান' উপাধি দিয়েছিলেন রুকনুদ্‌দীন বারবক শাহ্‌।

সুলতান হুসেন শাহ'র রাজত্ব (১৪৯৯-১৫১৮) কালেই আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩)। হুসেন শাহর সেনাপতি পরাগল খান ত্রিপুরা বিজয় করলে সুলতানের কাছ থেকে চাটিগ্রাম জাগীর পান। ইনি নিজের সভাকবির মর্যাদা দেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে এবং তাকে দিয়ে রচনা করান মহাভারত কাব্য। পরাগলের রাজসভায় প্রত্যেক দিন মহাভারত পাঠ হতো। বাংলায় রচিত প্রথম মহাভারত এই অনুবাদ গ্রন্থটি। পরাগল পুত্র ছুটি খানও মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন মহাভারতের। এই ছুটি খান মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই উৎসাহে অনুবাদ-কার্য সম্পাদন করেন শ্রীকর নন্দী। এই বংশের অন্যতম সুলতান ফীরাজ শাহ। তাঁরই উৎসাহে শ্রীধর রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। সেকালে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া ভেঙ্গেছিল সাহিত্য। সূচনাকালে বঙ্গসংস্কৃতি একারণেই অনেকটা আবিলতা-মুক্ত ছিল। একালে সেকালের এই ধারণাটা আর বহতা নয়।

বলার কথা, সেকালেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল। তা ছিল রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল অনাবিল।

সেটাই ছিল মিলনের প্রতিশ্রুতি। একালে সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতিকে তা গ্রাস করছে। একালে কবিকে তাই পরিচিত করান হয় হিন্দু বা মুসলমান কবিরূপে। হয়তো বহু পূর্বেই এটা শুরু হয়েছিল। আমরা তার বিষময় ফলটা ভোগ করছি। একালে মানুষের সবরকমের সম্পর্কে এবং বাহ্যিক ক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি আজ উপহসিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সমস্ত অর্গল আজ বন্ধ। সমস্যা ঠিক কোথায়? কিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি আক্রমণ করছে আমাদের তা জানার আগে সাম্প্রদায়িকতার একটা রূপরেখা কিংবা সংজ্ঞা স্থির করে নেওয়া দরকার।

সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ

সাম্প্রদায়িকতা বহুমাত্রিক। একে কেবলমাত্র একটি ধারণামাত্র বলতে পারলে ভালো হতো। সেকথা বলা যাচ্ছে না। এটি যুগপৎ কর্ম এবং তত্ত্বের সমন্বয়। তত্ত্বের দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতা হলো অবয়বহীন, কিন্তু ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত একটি ধারণা। ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর এই ভেদবুদ্ধি প্রভাবিত ধারণাকে নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা তখন আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশের ভয়াবহ রূপ হলো এক সম্প্রদায় যখন অপর সম্প্রদায়ের উপর দৈহিক বল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যায় যার পরিসমাপ্তি। ভাবগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িক কার্যক্রম নিয়ত বিদ্বেষ প্রচার করে থাকে। তার জন্য গুজব প্রচার করা হয়। নিয়ত উত্তেজনা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নানারকম সামাজিক বিধি-নিষেধের বিধি-বিধান প্রচার করা হয়। তা মান্য করতে সমাজের মানুষকে বাধ্য করা হয়। এটা করা হয় ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন সৃষ্টি করে এবং সামাজিক সংস্কার প্রচলিত করে। এই সংস্কার মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই বহন করে চলে।

ফলে এমনও দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বক্তৃতা করার সময় বহু মানুষের মনে সাম্প্রদায়িক সংস্কার কাজ করে। এইভাবে নিয়ত প্রচার এবং সংস্কার মান্য করার ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনা সব-সময়েই বিভিন্ন সমাজের মানুষের মনে সুপ্ত থাকে। সামান্যতম কারণেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। এটা হতে পারে আকস্মিকভাবেও। কিন্তু তা খড়ের চালায় আগুনের মতোই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একবার ছড়িয়ে পড়লে এর প্রভাব হয় সর্বাত্মক। ফলে সংজ্ঞা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে সুচিহ্নিত করা একটা কঠিন প্রক্রিয়া। তাই সদর্থক পথে নয়, নঞর্থকভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করা সহজ।

কোথায় নেই সাম্প্রদায়িকতা? সাম্প্রদায়িকতা আছে ধর্মে, সমাজে,

রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, বর্ণে, সম্প্রদায়ে, ভাষায়, বিবাহে, খাদ্যে, ভৌগোলিক বিভাজনে, সংস্কৃতিতে, নামকরণে, শিক্ষায়, ক্রীড়াভূমিতে—এককথায় সর্বত্র। ফলে সাম্প্রদায়িকতার আত্মপ্রকাশের জন্য স্থান, কাল, সময় এবং পাত্র—এর কোনটাই অপরিহার্য নয় বা এর কোন একটার উপর সাম্প্রদায়িকতা নির্ভরশীল নয়। তথাপি, কাজ চালাবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার একটা সংজ্ঞা দিতে হয়। আর তা করতে পারলে আলোচনা সহজ হয়।

প্রখ্যাত লেখক প্রমোদ কুমার তাঁর কমিউন্যাল আইডিয়লজি : ইটস্ বেসিস্, ডাইমেনশনস্, অ্যাণ্ড সোশ্যল্ অ্যাপীল (Communal Ideology : Its basis, Dimensions, and social appeal-Vol-XIII) গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "Communalism is an ideology. It is not a total ideology and it is not an ideology of a particular class . Communalism is a distorted ideology as it reflects objective reality not inadequately but in a distorted way." এই সংজ্ঞায় দেখা যাচ্ছে কুমার সাম্প্রদায়িকতাকে বলেছেন, 'একটি মতবিজ্ঞান'। আবার এও বলেছেন, এটা কোন, "সুসমন্বিত মতবিজ্ঞান নয়"। তিনি মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতা হলো, "একধরনের বিকৃত মতবিজ্ঞান"। এও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এই বিকৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এক ধরনের "উদ্দেশ্য-মূলক বাস্তব চিত্র"। আর তা অসম্পূর্ণ কিংবা সম্পূর্ণ দুটোই হতে পারে। যাই হোক না কেন, তা হবে 'বিকৃত পথে'।

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা সাম্প্রদায়িকতার সাধারণ লক্ষণরূপে বিবেচনা করতে পারি মতবিজ্ঞান শব্দ দুটি, আর বিশেষ লক্ষণরূপে মেনে নিতে পারি উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত মতবিজ্ঞান শব্দসমূহ। বিকৃত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, সাম্প্রদায়িকতা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সূত্র সমন্বিত নয়। সাম্প্রদায়িকতা সার্বিকভাবে কোন রকম সৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা প্রয়োগের মাপকাঠিতেও

বৈজ্ঞানিক নয়। এর পরিণতি কখনোই পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। এও মনে রাখতে হবে, ঐ পরিণতি কতটা ব্যাপক আকার নেবে তা বলা যায় না। আবার কোন একটা কারণে সাম্প্রদায়িকতা যে পরিমাণ রক্তক্ষরণের উৎস হতে পারে অনুরূপ কারণে দ্বিতীয় বার রক্তক্ষরণ একেবারেই নাও হতে পারে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতা হলো স্বার্থপরতা। অন্যের হিত নয়, নিজ হিত হলো সাম্প্রদায়িক চিন্তার লক্ষণ। এই 'নিজ' শব্দটিকে কোন সম্প্রদায় অর্থে গ্রহণ করতে হবে। যখন কোন জনসমষ্টি, ধর্ম, অঞ্চল ভাষা বর্ণ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে একত্রিত হয় এবং ঐ জনসমষ্টির জন্য ক্রমাগত দাবী জানাতে থাকে তখন তা সাম্প্রদায়িক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ জনসমষ্টি নিজেদের সংবদ্ধ রাখার জন্য। নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভাষার বন্ধন অবলম্বন করে ক্রমাগত দাবী জানাতে থাকে তাদের নানারকম সুবিধার জন্য। এটাও তারা প্রচার করে তারা বঞ্চিত এবং তাদের সমাজভুক্ত নয় এমন সকলেই গোটা দেশ বা অঞ্চলের উৎপাদন, শিক্ষা, চাকুরী ইত্যাদির সবটা কিংবা বেশীটা নিয়ে নিচ্ছে। অথবা অন্য সম্প্রদায়কে সরিয়ে দিতে হবে। এটা স্থানচ্যুত করে বঞ্চিত করে কিংবা হত্যা করে করা হয়। বিশ্বময় উদ্বাস্তু সমস্যা এই সাম্প্রদায়িক বিরূপতারই সমস্যা। সাম্প্রদায়িক হত্যার নানা ঘটনা আছে। কিন্তু হিটলারের ইহুদী নিধন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চূড়ান্ত উদাহরণ। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চাকুরীর সুমারি নিলেই সাম্প্রদায়িক বঞ্চনার চিত্র স্পষ্ট হবে।

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিন্তু তাকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না কেন? সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে। তাদের হয়ে দাবী জানায়। অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করে। যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বহুসংখ্যক মানুষ সর্বদাই থাকে বঞ্চিত। তাই তারা বঞ্চনা নিরসনের কথা শুনলেই তা

বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয়। সাম্প্রদায়িক নেতার জোর এইখানে। সাম্প্রদায়িক নেতা এটাই প্রচার করে যে, বিরোধী সম্প্রদায়কে সরাতে পারলেই তার নিজ সম্প্রদায়ের সকলের দুঃখ ঘুচবে। এই পাওয়া কথাটা শুনিয়ে সাম্প্রদায়িক নেতা তার আসনটি স্থায়ী করে।

যদিও আমরা আলোচনা করছি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে, তথাপি আমাদের লক্ষ্য হলো অসাম্প্রদায়িকতা। যেটা সাম্প্রদায়িক পূর্ব সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। মুসলমান ধর্মের ইতিহাস হলো মাত্র চোদ্দ শত বৎসরের। তার আগে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত অকল্পনীয়। যেটা এখন সবচাইতে বড় সাম্প্রদায়িকতারূপে বিরাজমান। খ্রীষ্টান ধর্মের ইতিহাস মাত্র দু'হাজার বছরের। দু'হাজার বছর পূর্বে তাই ইহুদী-খ্রীষ্টান সংঘাত ছিল না। হিটলারের ইহুদী নির্জন দু'হাজার বছর আগে হতেই পারত না। শাক্ত-বৈষ্ণব সংঘাতও একালের কথা। যদিও কয়েকশত বছর আগে তা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আসলে ধর্ম সম্প্রদায়, কোনক্রমেই তা তিন হাজার বছরের আগে ছিল না। এই ধর্ম পূর্ব সমাজে তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও ছিল না।

এভাবে দেখা যাবে, শোষণ যখন ছিল না তখন সাম্প্রদায়িকতাও ছিল না। আদি সাম্যবাদী সমাজে সাম্প্রদায়িকতা এখনকার মত থাকতেই পারে না। কেননা, তখন কোন সম্প্রদায়ই ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা হলো 'বর্তমানের' সমস্যা। মানব সভ্যতার উৎস অসাম্প্রদায়িক। ভবিষ্যৎও হবে তাই। অবশ্য যদি আমরা বর্তমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎস চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করতে পারি। এভাবে দেখলে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা হলো সমাজের স্বাভাবিক গতি-বিচ্যুতি। স্বাভাবিক সমাজ গতি রুদ্ধ করে কিংবা তাকে বিচ্যুত করলে সমাজের প্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য তাই সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করতেই হবে। সমাজকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার স্বাভাবিক গতি। সভ্যতার ধারা বহতা রাখার জন্যই এটা প্রয়োজন।

কেন সমাজের স্বাভাবিক গতি ধরে রাখা গেল না ? আদিম সাম্যবাদী সমাজের একবার শেষ দিকে মানুষ পণ্য নির্মাণ ও বিনিময় করতে আরম্ভ করে। তখন থেকেই সমাজের সম্পত্তির উপর সমাজ মালিকানার বদলে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেয়। অধিক উৎপাদন এবং অধিক সঞ্চয়ের ইচ্ছা থেকেই বলবান দাস ব্যবস্থা কায়েম করে। সঞ্চয় এবং পরশ্রম-নির্ভর বিলাসী জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কতটা আত্মকেন্দ্রী করতে পারে তা দেখা যায় সামন্ততন্ত্রে। নিখুঁত পরশোষণের চিত্র হলো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এই শোষণ কায়েম রাখার জন্য শোষক অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে, নির্যাতনের নানা পথ নিয়েছে কিন্তু বিভেদ পন্থার তুলনা নেই। জনসমাজের মধ্যে একাধিক শ্রেণী সে কায়েম করেছে। একেক শ্রেণীকে একেক ধরনের সুবিধা কিংবা অসুবিধা দিয়েছে। বর্ণ বিভেদ, জাতি বিভেদ এবং অঞ্চল বিভেদ কায়েম করেছে। কিন্তু যেটি সে অব্যর্থভাবে ব্যবহার করেছে তা হলো 'ধর্ম'। মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস সঞ্চার করে তাকে সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা শোষকের এক অমোঘ অস্ত্র। শোষিত জনতা নিয়ত নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে নিয়োজিত থেকেছে ধর্মের নামে। ধর্ম সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে তাকে বিচ্যুত করেছে। ধর্মের নামে মানুষ যেভাবে পরস্পর বিভক্ত হয়েছে এমন আর কিছুতেই হয়নি।

সমাজ গতির বিচ্যুতি হলো, বহমান সংস্কৃতির ধারা, বহুমাত্রিক সমাজে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যা যৌথ উদ্যোগে চলছিল তার বিরোধিতা করা কিংবা তাকে ব্যাহত করা। আবার কখনো কখনো কোন এক গোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা অঞ্চলের প্রাধান্য দেওয়া। যে প্রাধান্য এদের স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া উচিত ছিল না। বহুভাষী দেশে কোন একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে সেই ভাষাভাষী জনগণ কিছুটা সুবিধা পায়। অপর ভাষাগোষ্ঠী এতে ক্ষুব্ধ হয়। দেখা দেয় ভাষা সাম্প্রদায়িকতা। পিছিয়ে আছে এমন জনগোষ্ঠীকে কিছু সুবিধা দেওয়াকে এই পর্যায়

বিবেচনা করা ঠিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গের টোটোদের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। কোন গোষ্ঠীকে বঞ্চনা করাও একধরনের সাম্প্রদায়িকতা। মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় একসময় আদর্শ যোদ্ধা বলে বিবেচিত হ'ত। বৃটিশ প্রশাসন ধীরে ধীরে তাদের সামরিক বাহিনী থেকে সরিয়ে দেয়। আম্বেদকর এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এই বঞ্চনার বিষময় ফল আজ সমাজকে পিছু টানছে। বিহারের ভাগলপুরের দাঙ্গার পর সিল্ক শিল্প দারুণ মার খায়। ওখানে মুসলমানগণ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দাঙ্গায় তারা বিপর্যস্ত হলে শিল্পটিও থমকে থাকে। বঞ্চনা মানেই বিচ্ছিন্নতা। সাম্প্রদায়িক পরিবেশ এই বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। বঞ্চিত জনগণ সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারে না। ফলে সমাজের গতি স্তব্ধ কিংবা শ্লথ হয়।

এই বঞ্চিতেরা সংঘবদ্ধ হয়। সৃষ্টি হয় দুই কিংবা একাধিক বর্গের। এরা পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়। থেকে থেকেই এই মুখোমুখি দাঁড়ান এবং সম্প্রদায় বিরোধিতা। আজ বাংলাদেশে যে সংস্কৃতির বিকাশ হচ্ছে তা তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এরাই একেবারেই সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ছিল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে। ফলে অখণ্ড বাঙলার দুই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী হানাহানি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় অ-বর্ণ হিন্দুদের কথা বলা যায়। আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে, তা তো এতাবৎকাল যাদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাদের আন্দোলন।

ভারতের শহরগুলোর তুলনায় গ্রামগুলো ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ-নৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে। উত্তর স্বাধীনতাকালে কৃষিউন্নতির কথা ভাবলে আমরা পরিমাপ করতে পারি কত বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এদেশের। শিল্পের সঙ্গে কৃষিব্যবস্থা যদি উন্নত করা যেত ভারতের খাদ্যসম্পদ আজ কত বড় ভরসা দিত দেশের অর্থনীতিকে। গ্রাম এবং শহরের এই অসম বিকাশও একধরনের সাম্প্রদায়িক বিভেদ এনে

দিয়েছে। যার মূলে আছে অর্থনীতি। এসব হতে পারে ভ্রান্ত সরকারী নীতি, কোন জনগোষ্ঠীর অভিমান কিংবা প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকার জন্য। ধর্মীয় কারণেও এই অসাম্য আসতে পারে। সমুদ্রযাত্রা একসময় হিন্দুদের কাছে অধর্মীয় কাজ বলে বিবেচিত হত। কাজটা চলে যায় মুসলমানদের কবলে, এমনকি বহু দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে কেবলমাত্র নাবিকেব কাজ করার জন্য। আবার মাদ্রাসার প্রতি ধর্মীয় আকর্ষণে মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে। তারা এজন্য বহুরকম চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

পিছিয়ে পড়া সমাজে এইভাবে একটা বৃত্তের সৃষ্টি হয়। ধরা যাক 'ক' জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়েছে। এর কারণ তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি। শিক্ষার অভাবে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। তারা চাকুরী পায় না একারণেই তারা গরীব। আবার তারা গরীব বলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কাজটা সময়সাপেক্ষ। কোন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এক প্রজন্মে অসম্ভব। কিন্তু শিল্প স্থাপন করে বিশেষ করে কুটির শিল্পের মাধ্যমে একাজটা শুরু করা যায়। ভূমিব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে, উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে এই অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে এদের শিক্ষা গ্রহণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু করতে হবে। এর সঙ্গে আছে ইজ্জতের সওয়াল। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী শিক্ষা পেলেই যে ইজ্জত পাবে এমন কোন কথা নেই। দেখা যায় পিছিয়ে থাকা সমাজের কেউ চাকুরী পেলেও তাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা হয়। যে সকল ভুল সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন শ্রেণীর কেউ করলে উপেক্ষা করা হয়, সেই ভুলটা পিছিয়ে পড়া সমাজের কেউ করলে তার বর্গের কারণেই এটা হয়েছে বলতে অনেকেই দ্বিধা করে না। এ যেন ধনী আত্মীয়ের

বাড়ি গরীব কুটুমের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার মতো—গেলেও সঙ্কোচ আবার না গেলেও মান যায়।

সাম্প্রদায়িক কুম্ভকর্ণ এই রকম একটা পরিস্থিতিতে জেগে উঠে। সম্প্রদায়ের নেতা হতে হলে চাই জনতার আনুগত্য। সেটা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রচার করে যত সহজে পাওয়া যায় তত সহজ হয় না 'আদর্শ' ও 'সত্য' প্রচার করে। আদর্শবাদীর পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কেননা তাকে কেবল অধিকারের কথা বললেই চলে না। বলতে হয় দায়িত্বের কথাও। সাম্প্রদায়িক নেতা কেবলমাত্র তার সম্প্রদায়ের কাছে দায়বদ্ধ। সার্বিক কোন মূল্যবোধ প্রচারে তার কিছুমাত্র দায় নেই। তার পক্ষে তাই স্ব-সমাজের বঞ্চনার কথা বলা সহজ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই বঞ্চনার ক্ষেত্র নানাপ্রকারের। সাম্প্রদায়িক নেতা এই বঞ্চনার জন্য অন্য কোন সম্প্রদায়কে দেখিয়ে দেয়। প্রাক্ স্বাধীনতাকালে বহু সাম্প্রদায়িকতা এই কাজটাই করেছে। তারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাকার প্রতিটি ঘটনার জন্য অভিযোগ এনেছে অন্য সম্প্রদায়ের উপর। যদিও তার কারণ হলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই। বৃটিশ আমলে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের সমবিকাশ হয়নি।

মুসলমানগণ তাদের শাসনযন্ত্রটি ইংরেজদের কাছে হারায়। ইংরেজরা বাইরে থেকে মোঘলদের আঘাত হেনেছিল। মোঘল সাম্রাজ্য সেই আঘাত সহ্য করতে পারেনি তার কারণ তার আত্মরক্ষার শক্তি আগেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের দায় ইংরেজদের উপর চাপিয়ে মুসলমানগণ ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে। তারা ইংরেজী ভাষা শিখতে অস্বীকার করে। ইংরেজের অধীনে চাকুরী গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে। এতে তারা ভারতীয় জনজীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্ররোচনা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী নেতারা। এটা যে অসহযোগিতা থেকে ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৮৭৪ সালে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান কর্তৃক

আলিগড়ে মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠার পর। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের যোগ্য স্থান পেতে আরম্ভ করতেই বিরোধী সম্প্রদায় সক্রিয় হয়ে উঠে।

ঘুমভাঙ্গা কুম্ভকর্ণ অনর্থ বাধাবেই। কোন সম্প্রদায় হঠাৎ গতি পরিবর্তন করলে অনর্থের সম্ভাবনার সুযোগ থাকবেই। ঐ সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয় কিছু রাজনৈতিক ও মৌলবাদী নেতারা। একারণেই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলীম লীগ। এবং ১৯১৫ সালে স্থাপিত হলো হিন্দু মহাসভা। মাত্র সাত বছরের মধ্যেই (১৯১৩) লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে নেয়। ১৯২৩ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা কার্যকর হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তি এর পর আর পিছনে ফিরে তাকায় নি।

বহু ধর্মীয় নেতাই ধর্মকে বলেছেন অন্তরের ধন। সাম্প্রদায়িকবাদীরা এই ব্যাখ্যা মেনে নেয় না। তারা ধর্মকে বাইরের আচরণীয় একটি তত্ত্ব মনে করে। নিয়ত নতুন ব্যাখ্যা এবং আচরণ-বিধি প্রবর্তন করা হয়। তা মান্য করতে বাধ্য করা হয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে। সম্প্রদায়ের জন্য একটি নাম স্থির করা হয়। নিয়ত প্রচার করা হয় তাদের নিয়ম এবং আচার অভ্রান্ত। মানুষকে বিশ্বাসী করে তোলা হয় এই নিয়মগুলোর প্রতি। এই বিশ্বাস আত্মসমর্পণের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভাবগত ধারণার প্রতি আত্মসমর্পণ এবং অপর সম্প্রদায়কে সদাসর্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা সাম্প্রদায়িক অভ্যাসে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক নেতা এইটাই চান। শাসক এই বিভেদপন্থাকে সমর্থন করে। এটা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। মানুষ যত বিভক্ত এবং পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠে, ততই তাদের শাসন করা সহজ হয়। ধর্ম-বিশ্বাস থেকে মানুষ ভাগ্য-বিশ্বাসী হয়ে উঠে। তারা শাসকের প্রতি অভিযোগ জানাতে ভুলে যায়। সবরকমের বঞ্চনার জন্য দায়ী করে আপন ভাগ্যকে। তথাপি যদি শাসকের প্রতি মুষ্টি উদ্যত করে শোষিত শ্রেণী, তখনই তাদের ক্ষোভকে বিপথগামী করা হয়

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মাধ্যমে। কোন দিন কখনো ধনীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে গরীবদের মধ্যে।

মুসলমানগণ মুসলমান বলেই পিছিয়ে আছে এ যেমন সত্য নয় তেমনি হিন্দুরা হিন্দু বলেই এগিয়ে আছে এও ভুল ধারণা। তাই যদি হতো তবে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই শোষিত শ্রেণীর অবস্থান বদলে যেত। তা হয়নি। কেবলমাত্র নতুন একটা শ্রেণী ক্ষমতার ভাগ পেল। ধর্মের নামে কিছু থেকে এই সুবিধা পেল। ভারত অবিভক্ত থাকলে অনেক কম সংখ্যক লোক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সুবিধা নিত। উচ্চ শ্রেণীর জন্য দেশ বিভাগ সুবিধা এনে দিয়েছে। ধর্মপরায়ণ হলো গরীবেরা। তারা ধর্মের শক্তিতে আস্থাবান। উচ্চবিত্তের লোক সকল ধর্মের উপাসনায় যায়। তারা কোন ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ নয়। ধর্মীয় কারণে প্রতিটি সংঘাত কিংবা দাঙ্গার সুফল ভোগ করে তারা।

পূর্বে বলেছি সাম্প্রদায়িকতা নানারকমের। কিন্তু তার অনেকগুলোই প্রতিকারযোগ্য। অন্ধ্ররাষ্ট্র গঠন নিয়ে যে আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছিল, অন্ধ্ররাজ্য গঠনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা গেছে। ক্রীড়া সাম্প্রদায়িকতা ক্রীড়া শেষে স্তিমিত হয়ে আসে। ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে কোন বিশেষ ভাষাভাষীর ক্ষোভ প্রশমিত করা যায়।

কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করা খুব কঠিন। এটা গড়ে উঠে একটা ধারণার উপর। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় ভাবে অপর ধর্মসম্প্রদায় ভুল করছে। তারা আগ্রাসী। ধর্মবিশ্বাস থেমে থাকে না। তা প্রতি প্রজন্মই তার পর-প্রজন্মকে দিয়ে যায় ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, আচরণ, গুরুমান্যতা এবং পরধর্ম বিদ্বেষ চালিয়ে চলা। তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সবচাইতে দৃঢ়বদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মীয় নেতারা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মানুষের আনুগত্য এবং আস্থা অর্জন করলো কেমন করে? ধীরে ধীরে কিন্তু সুচিন্তিতভাবে এটা করা হয়েছে। তাদের স্থির চিন্তার স্বরূপ ধরা পড়বে তিনটি বিষয়ে। শব্দ

ব্যবহারে, আহার্য গ্রহণে এবং বিবাহ ব্যবস্থায়। এই তিনটি মাধ্যমকে ধর্মীয় নেতারা এমন সুনিশ্চিতভাবে ব্যবহার করেছেন যে, মানুষ জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত আত্মনিবেদিত এবং নিগড়বদ্ধ জীব হয়ে পড়েছে। আজ মানুষ তার অজান্তেই ধর্মীয় জীবনযাপন করে, ধর্মীয় বিধান মান্য করে এবং ধর্মীয় বার্তা প্রচার করে। ধর্মসংঘের শক্তি এই জায়গায়। এই স্থানটি চিহ্নিত করা অসাম্প্রদায়িক শক্তির কাজ। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করা মানে এই তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতিকার। প্রথমে শব্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কেননা শব্দ শ্রেণী, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে সকলকেই শব্দ ব্যবহার করতে হয়। এমনকি মূক যে সকল ইঙ্গিত ব্যবহার করে তাতে শব্দেরই চিত্রকল্প। অতএব শব্দ-শক্তির কথাই প্রথম জানতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা পরিপোষণে শব্দের ভূমিকা—১

আধুনিক সমাজব্যবস্থার উৎসে আছে শ্রমশক্তির বিকাশ এবং বিভাজন। শ্রমবিভাজন সামাজিক মানুষকে পরস্পর নির্ভরশীল করে তুললো। এতে সমাজ বন্ধন দৃঢ় হলো। কেননা এই শ্রমবিভাজনই সম্ভব করলো সকলের মাল্য কিছু কিছু ন্যায়বোধের ধারণার। সমাজ দলিতা শ্রমবিভাজনকে একারণেই বলা হয় আধুনিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এই যে পরস্পর নির্ভরতা এর জন্য প্রয়োজন ভাব বিনিময়। ভাব বিনিময়ের উৎসে আছে ভাষা। ভাষার উপাদান হলো শব্দ। তাও এলো এই সময় থেকেই। একদিনে নয়। বহুদিনের বিবর্তন এবং সাধনার ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। ভাষায় কথ্যরূপ যেমন শব্দনির্ভর তেমনি লেখ্য-রূপ অক্ষরনির্ভর। অক্ষর, শব্দ এবং বাক্য এই নিয়ে ভাষা। উর্দুতে বলে হুরূপ, লব্‌জ এবং জুমলা। একেবারে প্রথমে এমনটা ছিল না। সকল প্রাণীর জন্যই ছিল কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ধ্বনি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এখনো ভাবের বিনিময় হয় ধ্বনির মাধ্যমে। মনুষ্য সমাজে কেবল-মাত্র অর্থবান ধ্বনিসমূহই হলো শব্দ। এখন শব্দকে ব্যাকরণমান্য হতে হয়। ব্যাকরণমান্য শব্দ দু'ধরনের—ক্রিয়াপদ ও নামপদ শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগে শব্দের এই রূপ হয়।

ভাষা সৃষ্টির পশ্চাতে আছে সুদীর্ঘকালের বিবর্তন, অভিজ্ঞতা এবং সাধনার ইতিহাস। কোনভাবেই ভাষাকে আকস্মিক পরিণতির ফসল ভাবা হবে ভুল। যদিও ধর্মীয় কাহিনীতে ঐরকমই বলা হয়েছে। বাইবেলে আছে নানা কাহিনী। ভাষা সৃষ্টি প্রসঙ্গেও আছে একটি কাহিনী। মহাপ্লাবনের পর কেটে গেছে বহু কাল। নোয়ার সন্ততির সংখ্যা তখন অগুন্তি। নোয়ার এক নাতির ছেলে নিমরোড় রাজা হয়ে বসলো। এই নিমরোড় অসৎ এবং দাম্ভিক। বাইবেলে বলা হয়েছে, ঐ সময়ে নাকি দুনিয়ার সকল মানুষ একটি মাত্র ভাষায় কথা বলতো। শাসন কাজের সুবিধার জন্য নিমরোড় একটি বড় শহর এবং একটি

মিনার তৈরী করতে আরম্ভ করে। রাজা নিমরোড় আদেশ দিয়েছিলেন যে, মিনারটি হবে স্বর্গ পর্যন্ত উঁচু।

ঈশ্বর জিহোবার এটা পছন্দ হলো না। তিনি এই নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিলেন। ঐ মিনারটি নির্মাণ করার জন্য বহু লোক কাজ করছিল। ঈশ্বর দেখলেন, এই সকল শ্রমিকদের কথা-বার্তায় একটিমাত্র ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি ভাবলেন এরা যদি নানা ভাষা ব্যবহার করে তবে আর এদের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্ভব হবে না। মিনার বানাবার কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় শ্রমিকেরা হঠাৎ একদিন নানা ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলো। কেউ কারোর কথা বোঝে না। নির্দেশ দেওয়া এবং তা মান্য করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। শহর ও মিনার গড়ার কাজও বন্ধ হয়ে গেলো। সেই অর্ধসমাপ্ত শহরটির নাম বাবেল বা বেবিলন। যার অর্থ হলো বিশৃঙ্খল অবস্থা।

ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ প্রসঙ্গে ভাষা-বিজ্ঞানীদের কাছে এমনতর মত গ্রাহ্য হয় একথা আগেই বলেছি। ভাষা হলো কণ্ঠোদ্গীর্ণ অর্থবান ধ্বনিসমষ্টি। বাঙ্ময় ধ্বনিসমষ্টির দৃশ্যরূপই হলো লিপি। আজ ভাষার প্রাণ তার ভাবানুষঙ্গে। কিন্তু মানুষ যখন প্রথম ধ্বনির মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে আরম্ভ করলো তখন শব্দে ভাবানুষঙ্গের পরিবর্তে প্রাধান্য পেত দৃশ্যানুষঙ্গ। পরিচিত পরিবেশ প্রসঙ্গেই ভাব বিনিময় হত তখন। শিকারে যাওয়ার জন্য আদিম মানুষ আকার ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিরও ব্যবহার করত। এই আকার ইঙ্গিতই ধ্বনির অর্থরূপ হয়ে উঠেছিল। কেননা, নির্দিষ্ট আকার ইঙ্গিত নির্দিষ্ট ধ্বনির জন্যই ব্যবহার করা হতো। মনোবিজ্ঞানী পাভ্লভের কণ্ডিশন রিফ্লেকসের মতই এটা হতো। তারপর এই ধ্বনি থেকেই আমরা পেয়েছি পতন শব্দটি।

ভাব বিনিময় অর্থে বোঝা যাবে অভিজ্ঞতা বিনিময়। অভিজ্ঞতা আসে কাজ করে। 'আজ কোন কাজ নয়'—একথা কাব্য-শোভন কিন্তু জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নয়। কাজ মানুষকে করতেই

হবে। তবে প্রত্যেকেই সবরকমের কাজ করেন না। করার দরকার হয় না। আবার যুগে যুগে কাজের সংজ্ঞা পাল্টেছে। বিভিন্ন কাজের বাজারদর ওঠানামা করে। দাবা খেলা চল্লিশ বছর আগেও ছিল উপহাসের বিষয়। আজ আর তা নেই। মনুষ্য সম্প্রদায় তার প্রাথমিক পর্বে ভাব বিনিময় করত দৈনন্দিন সেইসব বিষয় নিয়ে, যা তাকে বাঁচিয়ে রাখত। এই কর্মকেন্দ্রী ভাব বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হত ক্রিয়াপদের। তাই, 'ভাষা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রাচীন শব্দ মাত্রেই ক্রিয়া দ্যোতক ; আর এই ক্রিয়া দ্যোতক শব্দও প্রায়ই ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। নামবাচক শব্দ, ক্রিয়াবাচক শব্দের বহু পরে সৃষ্ট।"

ভাষা গঠনের এই প্রাথমিক পর্যায় 'ধর্ম', একালে ধর্মকে যেভাবে ভাবা হয়, তা ছিল না। ধর্মের আগে ছিল ইন্দ্রজাল। হয়তো তখন ইন্দ্রজালের প্রাথমিক রূপ সমাজে এসে গেছে। কিন্তু নামপদ যখন প্রচলিত হয়েছে ধর্ম তখন সমাজে তার স্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। ভাবের বাহন ভাষা। ধর্মীয় ধারণা প্রচারে ভাষার অবদান সমধিক। মানব মনে ধর্মের বিধি বিধান স্থায়ী করে দিতে তাই ধর্মানুষঙ্গ যুক্ত শব্দের ব্যবহার তখন থেকেই। এমনও দেখা যায় যে, বহু শব্দ তার নিজস্ব অর্থ হারিয়ে ধর্মগন্ধী সাম্প্রদায়িক অর্থেই প্রচলিত। অভিধানে 'চক্রপাণি' শব্দের অর্থ বলা হয় বিষ্ণু। চক্র শব্দের অর্থ চাকা বা চাকার আকারের কিছু। আর পাণি শব্দের অর্থ হলো হাত। তাই চক্র হাতে আছে এমন যে-কেউ চক্রপাণি হতে পারে। কিন্তু সেটি হবার নয়। এই ধরনের শব্দগুলো যোগরূঢ় শব্দরূপে অর্থাৎ একটি বিশেষ অর্থেই গ্রাহ্য। কাফের (আ) শব্দটির অর্থ হলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। কোন মুসলমানও 'ইমান' (আ) না মানলে কাফের বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু ভারতে প্রচলিত অর্থে কাফের মানে হিন্দু সম্প্রদায়। এমনকি তিনি ধর্মপথে অবিচল থাকলেও কিংবা 'এক' ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও। 'যবন' বলতে আদিতে বোঝাত আইওনিয়াবাসী গ্রীকদের। এখন বাঙালী হিন্দুরা যবন বলতে মুসলমানদের বোঝে।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও সম্প্রদায় চিহ্নযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং তার সদস্যদের বোঝাতে এখন 'জার্মান' এবং 'ইলিশ' শব্দ দুটি বহুল প্রচলিত। অপরপক্ষে মোহনবাগান ক্লাব এবং তার সদস্য বোঝাতে 'টিকটিকি' এবং 'চিংড়ি' শব্দযুগলও ক্রীড়াঙ্গনে যোগরূঢ় শব্দের রূপ পেয়েছে। আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত শব্দের চমৎকার উদাহরণ হলো 'ঘটি' এবং 'বাঙ্গাল' শব্দ দুটি। ঘটি বলতে বোঝায় জল রাখার পাত্র, এটি যুগপৎ পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পূর্ববঙ্গ বলতে এখনকার বাঙলাদেশ বুঝতে হবে। পূর্ববঙ্গবাসীরা কেন যে এই শব্দটির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বোঝাতে চায় তা বলা অসম্ভব। ঘটিচোর বলে একটি কথা আছে। যার অর্থ ছিচকে চোর। সেই অনুষঙ্গ এক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? অপর-পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বাংগাল শব্দটি ব্যবহৃত হয় পূর্ববঙ্গবাসীকে বোঝাতে। বঙ্গ থেকে যদি শব্দটি এসে থাকে তো তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু এখন শব্দটি ব্যবহৃত হয় তুচ্ছার্থে। অমার্জিত লোক এই অর্থে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্ববঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে দুই কিশোরকে ঝগড়ারত দেখেছিলাম। তাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল, একটি কিশোর বৈদ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অপরটি কায়স্থ সম্প্রদায়ের। উভয় উভয়কে মাত্র দুটি শব্দের দ্বারা গালি দিচ্ছিল। বৈদ্য ছেলেটি বলছিল, তুই কাউঠগা শুদ্দুর (শূদ্র)। কায়স্থ ছেলেটি উত্তরে বলছিল, তুই ঝাউরগা বৈদ্য। এই শব্দ দুটি কোন অভিধানে পাইনি। তাই এর অর্থ আমার কাছে অনধিগম্য। ওদের শব্দ ব্যবহার এবং দৈহিক ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, শব্দগুলি হীনার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে তুচ্ছ-জ্ঞানে এই অভিধা দিচ্ছে। শব্দ দুটির ব্যবহারও নিশ্চয়ই পূর্বেও ছিল। না হলে কিশোরের মুখে আসবে কেন। একে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বলা যাবে না। বলতে হবে বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-

যুক্ত শব্দ। 'বাহে'-ও এমন একটি শব্দ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে লিখেছেন, "বাহে, [উ. বঙ্গ. ব্রাদে] বি, উত্তর বঙ্গের মুসলমানী কথায় সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়।" সম্বোধন পদরূপেই এখনো এটি ব্যবহৃত হয়। সেই সঙ্গে এসেছে দোষ-গুণ-বাচক বিশেষণ পদের অনুষঙ্গ। এটি এখন সমতলের বাঙালীরা মালদা প্রভৃতি অঞ্চলের কোন কোন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করে। সম্মান কী করে অসম্মানে রূপান্তরিত হলো জানি না। কিন্তু বলার কথা এই যে, শব্দের এই ব্যবহার বিভেদ বাড়ায় এবং সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যা কল্যাণকর নয় কিছুতেই। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে শব্দের এইরকম ব্যবহার হয়েছে ভয়াবহ। বিশেষ করেই শব্দ যখন ধর্মীয় অনুষঙ্গযুক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শব্দ নিজে নিজে কিন্তু সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠে না। কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় কোন কোন শব্দকে যখন বিশেষ অর্থে কিংবা অনুষঙ্গযুক্ত করে ব্যবহার করে, তখনি তা সাম্প্রদায়িক পরিচয় লাভ করে। শব্দের স্বরূপ, উদ্ভব কিংবা বিকাশ যেদিক থেকেই আলোচনা করা যাক, শব্দ সর্বদাই সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। তাকে সম্প্রদায়ের রঙে রাঙিয়ে তোলা হয় মাত্র। ব্যাকরণ ভাষার বহিরঙ্গের আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে, সমগুরুত্ব সহকারে তার ভাবগত দিক নিয়েও আলোচনা করে। শব্দের ভাবগত দিক হলো অনুষঙ্গযুক্ত ব্যাপকতা। কেউ কেউ একেই বলেন, প্রতীকদ্যোতকতা। শব্দ একটি জিনিস কিংবা ভাবকে সংহত আকারে প্রকাশ করে। এইভাবে ব্যবহৃত হলেই শব্দটির পূর্ণ প্রকাশ হয়। একেই বলা হয় প্রতীকদ্যোতকতা। প্রতিটি শব্দই এক একটি প্রতীক জনমানসে তুলে ধরে। ব্যবহৃত হতে হতে তা সংস্কারে পরিণত হয় এবং স্থায়ী অর্থের বা ভাবের চিহ্ন হয়ে উঠে। এমনও হয়, কোন কোন শব্দ অতি ব্যবহারে কিংবা আঞ্চলিক প্রভাবে তার আদি প্রতীকটি হারিয়ে ফেলে। সেক্ষেত্রে শব্দটি নতুন প্রতীকের কাজ করতে পারে।

বৈয়াকরণগণ একেই বলেছেন, শব্দের অর্থ বিস্তার, অর্থ সঙ্কোচ এবং অর্থ সংশ্লেষ। "রাম শব্দের দ্বারা ব্যক্তি রামকে বুঝায়। রামের মহত্বের কারণে তা বড় কিংবা বিশাল অর্থে বিকল্প শব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকলো। সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় চরিত্ররূপে রামের প্রতিষ্ঠা লাভের পর 'এক' এই অর্থে রামের ব্যবহার স্থায়ী হলো। ওজন করার সময় অনেকেই এক কিলো না বলে, রাম, দুই, এইভাবে সংখ্যা গণনা করে। কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হলে রাম শব্দ বড় বোঝালেও তখন তা হয় হীনার্থে। ভাষাগত কারণে না হয়ে শব্দের বিশেষ অর্থ, ব্যবহার কিংবা গ্রহণযোগ্যতা যদি সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে হয় তবে, তা দুশ্চিন্তার কারণ হয় বৈকি। কেননা সাম্প্রদায়িকতা একটি সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শব্দ পরিচয় তাকে স্থায়ী করে। ব্যক্তির মানুষ পরিচয় অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক পরিচয় হয়ে উঠে প্রধান।

সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটি নাটকে এই বিষয়টি দেখলাম। সাম্প্রদায়িক সংঘাত শুরু হতে এক হিন্দু যুবক তার মুসলমান বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। কামাল নামের সেই যুবক কমল নামে ঐ পরিবারে বেশ ছিল। একদিন হঠাৎ সে বলে, আম্মা [বন্ধুর মাকে] ওকে [বন্ধুকে] পানি দিন। সকলের হাত স্থির হলো। খাওয়া বন্ধ হলো। মুসলমান যুবকের স্পর্শদোষে তাদের জাত গেল। পরম স্নেহে লালিত-পালিত সেই যুবক একটি শব্দের দ্বারা শত্রু হয়ে গেলো। পানি কিন্তু মুসলমানের শব্দ নয়। কোন শব্দই কোন সম্প্রদায়ের হয় না। তবু, যে সকল শব্দ আরবি কিংবা ফারসী থেকে এসেছে বাংলায়, তাকে মুসলমানী শব্দ বললেও একটা মানে বোঝা যায়। কিন্তু পানি! বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'পানি' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে :—পানি বি, জল, বারি। [পানীয়, স, পানি-হি] পশ্চিমবঙ্গের সংসদ বাঙলা অভিধানে বলা হয়েছে—পানি, বি, জল। [হি, পানি<সং পাণীয়] পানি শব্দ এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। এর অর্থ জল। যুগপৎ পশ্চিম-

বঙ্গ এবং বাঙলাদেশের অভিধানে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে। তথাপি অভিধান সম্পাদক নিজে যদি হিন্দু বাঙালী হন তো তিনিও পানি পান করবেন না। তিনি খাবেন জল। যদিও তরল পদার্থ পান করাই হয়।

বিপরীতক্রমে বাঙালী সমাজে কেউ জল খেতে চাইলেই বুঝতে হবে যে, ব্যক্তি হিন্দু বাঙালী। পানি সংস্কৃতজাত হলেও মৌলবাদী কোন মুসলমানের ঐ শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের কাছে 'জল' জলচল নয়। এ এক প্রহেলিকা। জল শব্দটির উৎস প্রসঙ্গে অভিধানে বলা হয়েছে সং√জল+অ (তৃ)] তাহলে শব্দটি বাঙালী মুসলমানের কাছে অচ্ছুৎ কেন? সম্ভবতঃ উর্দুভাষী মুসলমানগণ জল শব্দটি ব্যবহার করে না বলে। উর্দু যেহেতু হিন্দী বিধৌত হয়ে এসেছে এবং হিন্দী এসেছে সংস্কৃত থেকে তাই বহু সংস্কৃত শব্দ উর্দু ভাষায় স্থান পেয়েছে। উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী হিন্দুরা জল শব্দটি ব্যবহার করে না। তাঁরা পানি শব্দটি ব্যবহার করেন। তাই উর্দুতেও পানি জলচল। অনেকেই মনে করে উর্দু মুসলমানদের ভাষা।

ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিকতার সম্পর্ক আছে। শব্দকে ধর্ম যেভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা পৃথিবীর কোথাও সম্ভব হয়নি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে। এটাই তাদের মাতৃভাষা। কাশ্মীরী ভাষা কাশ্মীরের সকল হিন্দু-মুসলমানের ভাষা। কিন্তু উর্দু ভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ বিশ্বে উর্দুই একমাত্র ভাষা যার সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত কল্পা হয়েছে। উর্দু জানা এখন মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য বলে প্রচার করা হচ্ছে। এই একটিমাত্র নির্দেশের জন্যই পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলো। বাংলাদেশীরা এটা মেনে নেয়নি। তথাপি উর্দু ভাষাকে সাম্প্রদায়িক ভাষারূপে চিহ্নিত করার কাজটা সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভালোভাবেই করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইংরেজ ভারতীয়দের এই মনোভাবের সুযোগ নিয়েছে মাত্র।

উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি বলে যিনি এখনো বিবেচিত তিনি হলেন

মহম্মদ খালি কুতুবশা। এঁর রচনা পাওয়া গেছে। এর পূর্বে রচিত অন্য কোন কবির রচনা এখনো পাওয়া যায় নি। ইনি ছিলেন শাহে গোলকুণ্ডা অর্থাৎ গোলকুণ্ডার অধিপতি। মুসা নদী হায়দরাবাদ শহরের বুক চিরে বয়ে গেছে। এই নদীর বিপরীত দিক থেকে খালি দেখতেন ভাগমতী নামে এক কন্যা ওপারের লক্ষ্মীমন্দিরে পূজো দিতে যায়। ভাগমতীর সঙ্গে খালির প্রণয় হয় এবং বিবাহ হয়। ভাগমতীর নতুন নাম হয় হায়দরাব। দুটি শব্দের অর্থ অভিন্ন—ভাগ্যবতী। ভাগ্যবতীর অর্চিত লক্ষ্মীমন্দিরের চারদিকে চারটি মিনার করে দেওয়া হয়। এটিই হায়দরাবাদের নিজামের মুদ্রায় অঙ্কিত থাকত। ক্ষমতা ছিল অপসারণের, কিন্তু মুসলমান শাসক লক্ষ্মীমন্দিরের মূর্তিটি কিন্তু রক্ষা করেছে। একেই আমি বলছি সাংস্কৃতিক সমন্বয়। উর্দু ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। হলো ঠিক বিপরীত কাজ।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা সিপাহী বিদ্রোহ, যে-নামেই পরিচয় দেওয়া হোক ১৮৫৭ সালের সেই সংগ্রামকে, তার প্রতিক্রিয়া হলো দূরপ্রসারী। বিদ্রোহের আকস্মিকতা ইংরেজকে বিহ্বল করে দেয়। বিদ্রোহের তীব্রতা ইংরেজের পক্ষে হয়েছিল বিপর্যয়কর। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে এবং বিপর্যয় সামলে ইংরেজ পক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে এবং বিদ্রোহ দমনে সফল হয়। এই সাফল্যে আত্মহারা না হয়ে ইংরেজ দুটো সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম সিদ্ধান্ত হলো, ভারত শাসন করতে হলে, ভারতীয়দের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং ভারতীয়দেরই রাখতে হবে প্রশাসনের সামনের সারিতে। তারাই সামলাবে প্রতিদিনের ঝক্কি-ঝামেলা। ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে যে সব ছোটখাটো সংঘাত হবে, তাও সামলে দেবে এই ভারতীয়রাই। ইংরেজ ক্ষমতা ব্যবহার করবে এবং ফলভোগ করবে প্রশাসনের পেছনে থেকে। অর্থাৎ ক্ষমতা ভোগ করবে ইংরেজ কিন্তু ভারতীয়দের দমন-পীড়ন করবে ভারতীয়রাই।

ইংরেজের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল ভারতীয়দের মধ্যে যতদূর সম্ভব বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইংরেজ, প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানকে বেছে নেয় এবং যতরকমভাবে এদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা যায় সে চেষ্টা নিয়ত চালিয়ে চলে। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম পার্থক্যের কারণে যেসকল আচার-বিচার সম্প্রদায়গতভাবে পালন করা হতো, তা বাড়িয়ে তুলবার জন্য চেষ্টা করে। দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্থক্যকে ধর্মীয় বিদ্বেষে পরিণত করা হয়। ঐ সময় আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি। আদালতে ফার্সি ভাষার প্রচলন বন্ধ করে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চালু হলো। বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হলো ইংরেজ বিচারকের উপর। ইংরেজ বিচারক যেহেতু স্থানীয় রীতি-নীতি, ভাষা এবং লোকাচার জানে না, তাই তাকে সাহায্য করার জন্য দুজন সহযোগী নিয়োগ করা হলো। যার একজন হবে মৌলানা। যিনি মুসলমান বিচারপ্রার্থীর জন্য বিচারকের কাছে মুসলিম ধর্মীয় নির্দেশের ব্যাখ্যা করবেন। বিচারপ্রার্থী হিন্দু হলে হিন্দু ধর্মানুমোদিত কোন বিধিব্যবস্থা থাকলে বিচারপতিকে সেটা ব্যাখ্যা করে শোনাবেন সংস্কৃত জানা কোন হিন্দু পণ্ডিত। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সংস্কৃত-হিন্দু-পণ্ডিত সমার্থক করে দেওয়া হলো, অপরপক্ষে আরবি-ফারসি-উর্দু-মুসলমান-মৌলানাও সমার্থক হলো।

এতেই কোন বিভেদ স্থায়ী হয় না। বিভেদের কারণগুলো মানুষের মনে স্থায়ী সংস্কারে পরিণত হলেই বিভেদ স্থায়ী হয়। তারও ব্যবস্থা করা হলো। মৌলানা এবং পণ্ডিত তৈরী করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো যথাক্রমে কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজ। মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হলো আরবি এবং ফার্সি ভাষা। আমরা দেখবো ধীরে ধীরে এই আরবি ফার্সির স্থানে উর্দুকে আনা হচ্ছে। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার মাধ্যমে করা হলো সংস্কৃত ভাষাকে। ভারতীয়রা এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। এবং এও জেনে নিলেন আরবি, ফার্সি এবং পরে উর্দু মুসলমানের ভাষা আর সংস্কৃত হিন্দুর ভাষা। এর দ্বারা

মেনে নেওয়া হলো হিন্দু মুসলমানের ভাষা এবং সংস্কৃতি আলাদা। এবং এও গ্রাহ্য হলো যে, একে অন্যের ধর্মের কিছুই বোঝে না, জানে না। যদিও মোঘল আমলে উভয় ধর্মের মানুষের জন্য একজন মাত্র বিচারকই থাকতেন। আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। রাজনৈতিক কারণে নিশ্চয় সর্বদা সুবিচার হয়নি। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতির কারণে অবিচারের তেমন কোন অভিযোগ শোনা যায় নি।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার হিন্দুদের বিচারের সময় ইংরেজ বিচারপতিকে সাহায্য করতেন। একারণে ইনি ব্যবস্থাচন্দ্রিকা নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। যার ভিত্তিতে হিন্দু আসামীদের শাস্তি দেওয়া হতো। অপরপক্ষে মুসলিম আসামীরা শাস্তি পেত কোরাণ ও হাদিস নির্দেশিত পথে, তা মৌলানা যেমন ব্যাখ্যা করতেন। এই শ্যামাচরণ ছিলেন নামকরা পণ্ডিত। জানতেন আরবি, ফার্সী, সংস্কৃত, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষা। এ সত্ত্বেও তিনি মুসলমান নন বলে মুসলমানদের বিচারে মতামত জানাতে পারতেন না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিভাজন এই বিভেদ নীতির ফল। ভাষা এবং সম্প্রদায় অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার শুরু তখন থেকেই। "বিভেদ বাড়াও, শাসন কর", এই নীতির প্রয়োগে ইংরেজের সাফল্য তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত। ভারতীয়রা এটা মেনে নিল। তারা কী অবেচতনে এই বিভেদ চাইছিল? প্রতিবাদের সেটাই ছিল চরম মুহূর্ত। সেই সময় হিন্দু-মুসলমান কারোর কিছুই বলার ছিল না! অথবা বলার মত কথা থাকলেও বলা হলো না। হারিয়ে গেলো মিলনের মুহূর্তটি। সেদিনই ভাঙলো মিলনমেলা।

দ্বিতীয় পর্যায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। কলকাতা মাদ্রাসা কিংবা সংস্কৃত কলেজের উন্নতিতে যথাক্রমে কোন হিন্দুর বা মুসলমানের অবদান নেই, তা নয়। কিন্তু কলকাতা মাদ্রাসয় কোন হিন্দু কিংবা সংস্কৃত কলেজে কোন মুসলমান ছাত্র পড়ত না। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষায়ও এলো বিভাজন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ।

মাদ্রাসায় চিকিৎসাবিদ্যার বিষয় ছিল হাকিমী শাস্ত্র। একারণেই মুসলমানরা রোগে দাওয়াখানায় গিয়ে হেকিমের কাছ থেকে দাওয়াই নেয়। একই রোগে হিন্দু রোগী কবিরাজের কাছে কবিরাজের বাড়ি গিয়ে পাচন নেয়। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে, ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানে দেয় সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ইংরেজি ধারায় চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষা শুরু হলো। শিক্ষার মাধ্যম করা হলো ; উর্দু, বাংলা এবং হিন্দী। এই প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে মেডিকেল কলেজ নাম নেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিভেদ, দুটি সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল তো বটেই, কালক্রমে অপরিচিত করে তুলল। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে এলো বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দু মুসলমান এরপর রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক জগতে আর এক হতে পারে নি। চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা এই মিলন সম্ভব হয়নি। একমাত্র ধর্মীয় অনুমোদন পেলেই হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভব হয়েছে। সামান্য সময়ের জন্য খিলাফৎ আন্দোলন এই মিলন সম্ভব করেছিল। এটা তো জানাই যে খিলাফৎ মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলন।

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের লগ্ন এসেছিল। কিন্তু তখন, বিভাজন ব্যবস্থা যখন একের পর এক প্রয়োগ করা হলো, তা মেনে নেওয়া হলো। আজ সেই অবহেলার মুহূর্তটির কথা স্মরণ করলে জাতীয় ব্যর্থতার কথাই ভাবতে হয়। সেই মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না। অতএব শুরুটা করতে হবে একেবারে নতুন করে, মূল থেকে। ফিরে আসা যাক আবার সেই শব্দ ব্যবহারে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা প্রসঙ্গে।

বাঙালী মুসলমানের কাছে পানির কৌলীন্যই আমরা দেখেছি, যদিও পানিকে হিন্দুদের ত্যাজ্যপুত্র করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। কেননা, পানি শব্দটি চর্যাপদে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যবন' স্পর্শ দোষে পানিকে কুল হারাতে হলো।

উর্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা এমন একটা ধারণা অনেকেরই আছে। সৈয়দ এহতিশাম হাসিনের প্রবন্ধ—'উর্দু জবান কি ইবতদায়' এ বিষয় অনেকের ভুল ধারণার নিরসন করতে পারে। সমস্যা হলো, যাদের ভুল ধারণা আছে তারা অনেকেই উর্দু জানেন না। আর হাসিনের প্রবন্ধটি লেখা উর্দুতে। এতে হাসিন দেখিয়েছেন যে, বহিরাগত মুসলমানগণ ভারতে এসে তাদের মাতৃভাষা সামান্যই ব্যবহার করেছেন। ব্যবহার করেছেন এদেশের হিন্দোস্থানী ভাষা। উর্দুকে প্রথমে তাই হিন্দোভিও বলা হত। লেখক স্পষ্ট বলেছেন, বহিরাগত মুসলমানদের কিছু কিছু বুলি স্বাভাবিক ভাবেই উর্দুতে এলেও, "ইস লিয়ে হম আসানিকে লিয়ে কহা সকতে হ্যাঁয় কা উর্দু জবান খড়ি বোলি কে অন্দর নিখর কর এইসি জবান বন গিয়া······" (একারণে সচ্ছন্দে বলা যায় উর্দু ভাষা খড়ি বোলির অন্দরমহল থেকে বিধৌত হয়ে এত সার্থক রূপ গ্রহণ করলো যে······) তথাপি উর্দুকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষারূপে চিহ্নিত করা হয়।

জল-পানি নিয়ে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা তাকে জল-ভাত বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে জলযুক্ত সকল শব্দকেই কাফেরের স্পর্শদোষে দুষ্ট মনে করা হয়। অসাম্প্রদায়িক বহু মুসলমানের কাছে শুনেছি 'জলপানি'র মত [ছাত্রবৃত্তি] স্মৃতিধন্য শব্দটিকেও মৌলবাদীরা ব্যবহার করতে দিতেন না। জলকুন্তল (শৈবাল)-এর মত মনমুগ্ধকর অতি তরল শব্দটিও না-পাক। জলখাবার তো বলা যাবেই না। বলতে হবে নাশতা। আলাওল যদিও 'জলছত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। (স্থানে স্থানে অন্নশালা দিতে জলছত্র) মৈমনসিং গীতিকায় আছে, 'বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর।' এখন সম্ভবতঃ পানিটুঙ্গীর ঘর বলে পড়তে হবে। পানি বসন্ত হলেও হিন্দুরা জলবসন্তই বলবে। যদিও 'ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পান ফল' তারা খায় বৈকি! 'পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় উঠ না', উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে—অন্ততঃ গ্রামে এবং শৈশবে। সত্যেন্দ্রনাথের 'চুপ চুপ—ওই ডুব দ্যায় পানকৌটি' এখনও শ্রুতি দুষ্ট নয় কারো কাছেই।

সাম্প্রদায়িক অনুমোদনের ফলে ঐতিহ্য লুপ্ত আর একটি শব্দ হলো, 'আণ্ডা'। ঈশ্বর গুপ্ত চেয়েছিলেন, 'গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ'? অনেকেরই মনের কথা এটি। উভয়বঙ্গের অভিধানেই বলা হয়েছে আণ্ডা শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত অণ্ড থেকে। তাই বলে কোন হিন্দু বাঙালী খাবার দোকানে গিয়ে আণ্ডার ওমলেট চাইবে না। আণ্ডার ওমলেট চাইলে বুঝতে হবে ক্রেতা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। ক্রেতা ডিমের ওমলেট চাইলে বুঝতে হবে লোকটি অবশ্যই হিন্দু। ডিম শব্দটিরও উদ্ভব সংস্কৃত ডিম্ব থেকে। এবিষয়ও সহমত পোষণ করেন উভয় বঙ্গের আভিধানিকেরা। আণ্ডাকে মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব শব্দ বলেই বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রেও আছে উর্দু ভাষার প্রভাব। আর উর্দুতে শব্দটি এসেছে খড়িবোলি "নিখর কর"। আত্মত্যাগ এবং আত্মপ্রতারণার এ এক অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব ধর্মীয় অনুমোদনেয় জন্যই স্থায়ী হয়েছে। ভাববাদীরা নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা এটা সম্ভব করেছে। হাজারো শব্দে তারা মাখিয়ে দিয়েছে ধর্মের মোহাঞ্জন। এ বিভ্রান্তির পশ্চাতে আছে অজ্ঞতা। ব্যবহারে ব্যবহারে গড়ে উঠেছে সংস্কারের আনুগত্য। দৃঢ় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বন্ধন। সমপরিমাণ শিথিল হচ্ছে মৈত্রীর আলিঙ্গন। বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পাশাপাশি বসবাসকারী মনুষ্য সম্প্রদায়। উদ্ভব ও বিকাশের চিহ্ন অনুসরণ করে বিচার করলে দেখা যাবে বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মূলতঃ ছিল অভিন্ন এবং সমগোত্রীয়।

প্রগতি আন্দোলনের যারা শরিক, তাদের অতি প্রিয় তিনটি শব্দ হলো, ইত্তেফাক (আঃ-ঐক্য) ইত্তেহাদ (আ-বন্ধুত্ব) এবং কোরবানি (আ-বলিদান বা আত্মদান)। এই শব্দত্রয় হলো এদের সংগ্রামী হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা থাকে সংগ্রামের ময়দানে। এঁদের মধ্যে যারা মাংসাশী, তাদের মধ্যে যারা হিন্দু বাঙালী, তারা একেবারেই অনভ্যস্ত কোরবানি করে বকরি খেতে। মুসলমানদের বকরি বাঘের সঙ্গে একঘাটে পানি পান করে। বাঘে-

বকরিতে একঘাটে যিনি পানি পান করাতে পারেন তিনি অতি শক্তিধর। কিন্তু ঐ শক্তিমান যতই শক্তি ধরুন, তিনি যদি হন হিন্দু বাঙালী তবে তিনি জল খাওয়াবেন বাঘে-গোরুতে; তিনি বকরির ধারে কাছে যাবেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' হ্যাঁ বাঘকে বাঙালী ভয় পায় না। ভয় পায় গোরু আর বকরিকে। গোরু আর বকরির তাড়ায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালী ছুটে চলেছে। তাঁর সময় নেই একটু দাঁড়িয়ে অতীত দেখার। খাদ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভাষা, উদ্ভব এবং বিকাশের ঐতিহ্য এবং ধারা এঁদের অভিন্ন। তথাপি আজ বিভেদটাই বড় হয়ে উঠেছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ শব্দ ব্যবহারে বিভিন্নতা। উভয় সম্প্রদায়ই অভিন্ন অনুষ্ঠানে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এই বিভেদ বাড়িয়ে তুলেছে। এই শব্দগুলো ব্যবহার না করলে সে তার আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশা করতে পারছেনা। ধর্মীয় শাসন তাকে এতে বাধ্য করছে। ফলে এই শব্দগুলো তাঁদের তাড়া করে তাড়িয়ে নিয়ে চলছে বিপরীত দিকে।

বাঙালী হিন্দুর ঘরে শিশু জন্মায় কিন্তু বাঙালী মুসলমানের ঘর আলো করে শিশু পয়দা (আ) হয়। শৈশবে এক সঙ্গে খেলতে খেলতে মুসলমান শিশুটি যাচ্ছে এ-পাড়ার মাদ্রাসায়, মৌলবির কাছে প্রাথমিক পাঠ নিতে। হিন্দু শিশু যাচ্ছে ও-পাড়ার পাঠশালায়, গুরু মহাশয়ের কাছে অধ্যয়নে। মুসলমান শিশু শিখছে আলিফ বে, পে, তে, টে, সে আর হিন্দুর সন্তান শিখছে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ। একেবারে হাল সময় সঙ্গতি থাকলে অবশ্য দুজনেই এ, বি, সি, ডি শেখায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সে অন্য প্রসঙ্গ। একজন শিখছে "রোজা সব পর ফরজ হায়।" অপরজন শিখছে দুর্গাপূজা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। অপর পক্ষে মুসলমান দুর্গাপূজা এবং হিন্দু ঈদের কথা ভাবছেই না। ঈশ্বরের কাছে হিন্দু প্রার্থনা করে তার কামনা পূরণের জন্য। মুসলমান আল্লাহর কাছে নামাজ আদায় করে তার ঈমান রক্ষার জন্য।

ন্যায় বিচারের আশায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আদালতে (আ) যায়। সেখানে বকীলের (আ) সাহায্য নিয়ে দরখাস্ত (ফা) করে। দেশের আইন (ফা) তারা মান্য করে। সাহেবের সঙ্গে বিবাদ দেখা দিলে চাকুরী থেকে ইস্তফা (আ) দেয়। জমির মালিক হতে কে না চায়। এজন্য তারা কবিলা (আ) করে। দরকার হলে ঋণ করে কিস্তি (ফা) শোধ করে। এবং কুস্তি (ফা) করে স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য কাবাব (আ) খায়। খাবার কথা থাক। আবার তা নিয়ে ভাবা যাবে। শাদির আসরে বিয়ের ভোজ এলে।

যে শিশুরা পাঠশালায় যায়, তারা বিকেলে বাড়ি ফিরে আসে। হিন্দু বাঙালী কিশোর-কিশোরী ডাকে ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, মা, বাবা, কাকা, কাকীমাকে। দেখে দাদা, দিদি, ভাই এবং বোনও স্কুল থেকে ফিরেছে। বাড়িতে এসেছে পিসিমা-পিশেমশাই, মাসীমা-মেশোমশাই। মুসলমান বাঙালী লড়কা-লড়কি (হি) বাড়ি ফিরে সোহাগ নেয় দাদা-দাদি (হি)-র। কাছে আসে আম্মা-আব্বা (আ)। আব্দার করে চাচা-চাচীর কাছে। বাড়িতে দেখে আপা (তু)। তাদের বাড়িতেও আসে ফুফা-ফুফি (হি) খালা-খালু (আ)। ওরা বেড়াতে যায় মামুর বাড়ি। সেখানে আছে নানা-নানি (হি) হিন্দু বাঙালী কিশোরের জীবনেও এটা ঘটে। তবে তারা যায় মামাবাড়ি। সেখানে আছে দাদু-দিদিমা।

কিশোর যুবক হয়। শুরু হয় বিয়ে-শাদির কথা। হিন্দু বাঙালী যুবক প্রেম করবে কিন্তু শাদি (ফা) করবে না। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন "শাহজাদীর শাদির দিনে নাচে হাজার বাঁদী।" কবি হাজার চেষ্টা করেও কোন রাজকন্যার বিবাহ সভায় হাজার কেন একটি বাঁদী (ফা) ও নাচাতে পারবেন না। মুসলমান যুবক হিন্দু বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হতে পারেন কিন্তু নিজে সে বিয়ে (বিবাহ-সং) করবে না, করবে শাদি। বিয়ে বাড়ির ভোজে বিরিয়ানীর প্রত্যাশা থাকে উভয় সম্প্রদায়ের আমন্ত্রিতের। তা হোক। হিন্দু বাড়ির বিরিয়ানীতে (ফা) অচল গোশত্ (ফা)। বিপরীতে, মুসলমান বাড়িতে চলবে না মাংস।

উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই খাচ্ছেন। হিন্দু বাড়িতে সকালে দেওয়া হবে জলখাবার আর মুসলমান বাড়িতে নাশতা (ফা)। মুসলমান গোসল (আ) করে, জিয়াফৎ (আ) জানায় এবং দাওয়াত (আ) দেয় দোস্ত (ফা) এবং রিস্তেদারকে। হিন্দু স্নান করে, আহার সেরে আমন্ত্রণ জানায় আত্মীয়কে এবং বন্ধুদের।

বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবেই। এটা কিছু নতুন কথা নয়। সেখানে আছেন শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, শালা এবং শালী। এই শেষের দুটি শব্দ বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু তিনটি ভাষাতেই চলে। শালা-শালীর তুলনা নেই। বাঙালী মুসলমান শওহর (ফা) তার বিবি (ফা) কিংবা আহলিয়া (আ) কে নিয়ে যাবে খোসরের (ফা) কাছে। সেখানে আছেন সাস।

টেবিল কিম্বা চেয়ার উভয় সমাজেই চলে। ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে যে সকল শব্দ তা গ্রাহ্য উভয় সমাজে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমাজের নিজস্ব যে সংস্কৃতি, মহিলাদের দ্বারা গ্রাহ্য এবং ব্যবহৃত শব্দের একটা ভাণ্ডার আছে। সেইখানে আছে সমাজবন্ধন এবং বিকাশের উৎস। সেই উৎসে থাকে সাম্প্রদায়িক শব্দগুলো। ফলে বাইরের জগতে বহু হিন্দু-মুসলমান এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যা তারা অন্দরে ব্যবহার করে না। বহু মুসলমানকে আমি বিভিন্ন পরিবেশে 'জল' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছি। তারা কিন্তু অন্দরে ওটি ব্যবহার করেন না। এ কারণেই টেবিল চেয়ারের পাশাপাশি মেজ (ফা) এবং কুরসি (আ) ব্যবহৃত হচ্ছে। বিছানা হচ্ছে বিস্তারা, ঢাকনী হচ্ছে গেলাপ (আ)। "পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া' দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। যদিও কালি তাঁর কাছে রোশনি (ফা) হয়নি। ফারসি জানা ইংরেজি জানার মতই এককালে সুশিক্ষার লক্ষণ ছিল। বিদেশী শব্দ ব্যবহারে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আসলে শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা এ প্রবন্ধের বিচার্য বিষয় নয়। বিষয় হলো বাঙালী সমাজের দুটি অংশ, হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করেন। শব্দ-

গুলি উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে না বলেই একটা সাংস্কৃতিক ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

মৃত্যুর সময়েও এই বিভেদ সমানে কাজ করছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দেহান্ত হয়। কিন্তু মুসলমান এন্তেকাল (আ) করে। মৃত্যুর পর মুসলমানের লাশ (ফা) কবরে (আ) দাফন (আ) করা হয়। হিন্দুর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করা হয়। মৃত্যুর পর মুসলিম লাশের জন্য হয় জানাজা (আ)। নজরুলের কবিতায় আছে,—

"কাল হবে বার জানাজা যাহার,
সে বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ"।

হিন্দুর মৃত্যুর পর সংকীর্তন করা বিধেয়। মৃত্যুর পর মুসলমান যায় জন্নাৎ (আ) কিংবা বেহেশতে (ফা) আর হিন্দুর মৃত্যুর পর স্থান হয় স্বর্গে কিংবা নরকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতরকম সামাজিক ক্রিয়া কর্ম আছে, সব কিছুতেই উপস্থিত এই ভাষা বিরোধ। যদিও হিন্দু-মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বাংলা। যতক্ষণ আপনি এই ভাষা ব্যবহার করছেন, মান্য করছেন, ততক্ষণ জানা যায় না এর পশ্চাতে কোন শক্তি সক্রিয়। এর বিরোধিতা করুন, একে উপেক্ষা করুন, দেখবেন মৌলবাদীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। তখনি জানা যায় কার প্রয়োজনে এবং কেন এটা চলছে। একারণেই মুসলমানের ঘরে বকুল ফোটে না। হিন্দুর ঘরে 'আলম' আসে না। এই শব্দ সাম্প্রদায়িকতাই বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমে হিন্দু মহিলাকে মিসেস বলতে উৎসাহিত করে। শ্রী অপবিত্র শব্দ। একারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ্মফুল প্রতীকরূপে গ্রহণে মুসলিম মৌলবাদীরা বাধা দেয়। বিপরীতক্রমে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সংস্কৃত পাঠে বাধা দেবার জন্য কিছু হিন্দু মৌলবাদীর প্রচেষ্টা তো ভুলবার নয়। সে সময় শহীদুল্লাহ সাহেবকে যে সকল রুচি বিগর্হিত প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাও সুখকর স্মৃতি নয় আজও। উপেক্ষা এবং অপেক্ষার মত সর্ববেদনাহর শব্দ দুটিও এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

সাবেক পূর্বপাকিস্তানের মৌলবাদী প্রবণতা প্রসঙ্গে আরো দুএকটি কথা বলার আছে। সেখানে নজরুলের কবিতায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব আছে অভিযোগে কবির কবিতা সংশোধন করে প্রচার করা হয়। ভগবান শব্দটিকে করা হয় রহমান। কৃষ্ণ শব্দ যুক্ত থাকায় কৃষ্ণচূড়া ফুলকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে গুলমোহর। রামনাম যুক্ত থাকায় রামধনুকে বলা হয় রঙধনু। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "প্রাক ব্রিটিশ যুগে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ কথনো জটিল আকার ধারণ করেনি। এমন কি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল"।

এই সব শব্দ এবং তার ব্যবহার কী তখন ছিল না? যে সমালোচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল উত্তম পুরুষ তাকে প্রথম পুরুষে নিয়ে গেলে আত্মরক্ষা হয় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। এই সমস্যায় মুখোমুখি হয়েছিলেন বাদশাহ আকবর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং নজরুল ইসলাম। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন আকবর বাদশাহ তার প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহি মতের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎস সন্ধান করে সমস্যাটি চিহ্নিত করেছিলেন এইভাবে—"যাদের সঙ্গে একাসনে বসায় নিষেধ তাদের আপন করা হবে কেমন করে?" বিবেকানন্দের মতামত স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হবে। জানা যায় যে, নজরুল তার শেষ জীবনে আকবরের মত ধর্ম সমন্বয়ের কথা ভাবতেন। ধীরে ধীরে কিন্তু সুচিন্তিতভাবে শব্দকে সাম্প্রদায়িক আকারদানের প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। মুসলমান শব্দটিকে একসময় 'ছ' দিয়ে লেখা হত। একালে হিন্দী ভাষায় অনাবশ্যকভাবে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই প্রতিফলন। হিন্দীকে হিন্দুর ভাষা করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এক মুসলমান যুবক একটি চমৎকার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তিনি বললেন, দেখুন আপনারা হলেন, দুর্গাশঙ্কর, মহাদেব প্রসাদ এবং লক্ষ্মীদেবী। আমরা নূর মহম্মদ,

হোসেন্নুর এবং রহমান। কেউ ভেবে এই নাম দিয়েছে কিনা জানিনা। কিন্তু ধর্ম এবং ঈশ্বর আমরা চেতনে তো বটেই, অবচেতনেও ব্যবহার করি। প্রথমেই আনতে হবে শব্দ চেতনা। নামকরণ থেকেই তার শুরু হোক। উৎস থেকেই সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি হতে হবে। প্রতিহত করার কাজটা জন্ম লগ্ন থেকেই চাই। জন্ম মাত্রই আমি অসাম্প্রদায়িক, এই চিন্তার প্রতিফলন চাই। তা নাহলে সাম্প্রদায়িকতা তার স্থানটিতে যেমন আছে তেমনি থাকবে।

আমরা মৌলবাদিদের নিন্দা করি, তারা তাদের কাজ করছে সদর্থক ভাবে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথাও আমরা বলি। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তারাও সুযোগ নেবে। এর বিরুদ্ধে বলা সঙ্গত। কিন্তু সেটাতো সদর্থক নয়। নঙর্থকভাবে প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা। সদর্থক প্রচেষ্টা হবে শব্দ ব্যবহারে ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অসাম্প্রদায়িক শব্দ ব্যবহারের আন্দোলন। ওরা যেখান থেকে শুরু করছে সেই উৎসে আঘাত করলেই সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহ রুদ্ধ হবে। মধ্যপন্থা কোন কিছুতেই কার্যকরী হয় না। তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া যায় মাত্র। আমাদের কাজও উৎস থেকে—মানব শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকেই তাকে সর্বঅর্থে অসাম্প্রদায়িক করতে হবে।

সঙ্কেত চিহ্নের পূর্ণ রূপ—আ = আরবি, ফা = ফারসি, হি = হিন্দী, ই = ইংরেজি এবং স = সংস্কৃত, তু = তুরকি।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা—খাদ্যে

আশির দশকের প্রথমে পূর্ণ সূর্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য, ভারতে সমবেত হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, অবশ্যই ভারতীয়, গ্রহণের সময় কোন রকম খাদ্য গ্রহণ করেন নি। বিজ্ঞানীরা এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছননি যে গ্রহণের সময় খাদ্য গ্রহণ অস্বাস্থ্যকর। তথাপি খাদ্য গ্রহণে এই অসম্মতির কারণ হলো সংস্কার। সংস্কার যেহেতু বিশ্বাস নির্ভর, তাই যুক্তির প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। খাদ্য সম্বন্ধে সমকালের মানুষ যুক্তির বদলে সংস্কার এবং ধর্মীয় নিষেধের দ্বারা চালিত হন। যুক্তির দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করলে মদ্য ও ধূমপান কবেই বন্ধ হয়ে যেত। খাদ্য গ্রহণে যুক্তিহীন ধর্মীয় সংস্কার এবং নিষেধ উপহাসের কারণ হয় কখনো কখনো কিন্তু অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় না আদৌ। দুর্ভাবনার কারণ এটাই।

পণ্ডিত বলে যারা সমাজে মান্য সেই যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বহু সংস্কার মান্য বলে গণ্য করেন। সংস্কারের প্রতি বিশ্বাস থেকেই তাঁরা এসব করেন। ধর্মের জোর এইখানে। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে সে। যুক্তি সেই বিশ্বাস টলাতে পারে না। সমালোচনা, 'সংস্কার-মান্য' মানুষের মধ্যে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সংস্কার মানার প্রবণতা যেন সর্বাধিক।

আয়ুর্বেদকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। কবিরাজী চিকিৎসা প্রণালী এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতেই চালিত হয়। এই শাস্ত্রে খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। চলতি সময়েও এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। যুক্তির আলোকেই ভেষজ বিজ্ঞান এগিয়ে চলছে। এই শাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মচিন্তার একটা যোগও আছে। তথাপি সংস্কার আর শাস্ত্রের দ্বন্দ্বে সংস্কারই মান্য হয়ে উঠে। বিপরীতটা হলে, সম্ভবতঃ; কিছু কিছু সমস্যার সমাধান সম্ভব হত।

খাদ্য নিয়ে সংস্কার এমন একটা পর্যায় চলে গেছে যে, একে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘাত। যা ছিল বিশেষ সম্প্রদায়ের মান্য ধর্মীয় নির্দেশ, তা আজ আন্তঃধর্মীয় সংঘাতের উৎস হয়ে উঠেছে। "তমস" উপন্যাসে এই প্রসঙ্গটি সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। ধর্মীয় নির্দেশে এবং সংস্কারের ফলে অখাদ্য বলে বিবেচিত পশুর মৃতদেহ দুই বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা স্থলে রেখে দেওয়া হয়। জনতা উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা বাঁধায়। যারা এই কাজটি করেছিল তারাই আবার শান্তি-শোভাযাত্রা করে সমাজ-মান্য নেতা রূপে নিজেদের স্থানটি পাকা করে নিল।

এভাবে না দেখে যদি মানব জাতির বিবর্তন ধারার সঙ্গে খাদ্য গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা এবং অভ্যাস ও তার কারণকে যুক্ত করে দেখা হয়, তবেই বিষয়টি অধিকতর অর্থবহ হয়ে উঠবে। মানুষের খাদ্যাভাস নির্ভর করে যোগানের উপর। ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে তীব্র হয়ে উঠেছিল সরিষার তেলের সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য তেল রূপে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সরিষার তেল। ঐ সঙ্কটের সময় বাঙালীরা বিকল্পে বাদামজাত এবং অন্যান্য ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তেল সঙ্কট মোকাবিলায় সরকার রেপ্‌সিড এবং পাম তেল সরবরাহ করতে থাকেন। এই বিকল্প তেলগুলি সরষের তেলের জায়গা নিয়ে নেয়। এগুলো ব্যবহারে বাঙালীরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশক থেকে চালের সঙ্গে সঙ্গে গম সরবরাহ করা হয়। গম এখন বাঙালীর অন্যতম প্রধান দানাশস্য খাদ্যরূপে চলে আসছে। সিদ্ধ চালের যোগান কমে যাওয়ায় আতপ চালও খাচ্ছে বাঙালীরা। এটা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আগে ভাবাই যেতো না।

এই পটভূমিকায় আমরা মানব-সমাজের একেবারে প্রথম অবস্থার কথা ভাবতে পারি। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, তৃতীয় ভূ-স্তর যুগে, হয়তো গ্রীষ্মমণ্ডলের কোথাও দেখা পাওয়া গেল বানরকল্প এক মনুষ্যজাতির। তারা বসবাস করত গাছে। ভূমি তখন পর্যাপ্ত উর্বরা শক্তি পায় নি।

ভূমিকে উর্বরা করার ধারণাই ছিল না সেসময়ের প্রাণীজগতে। তাদের তাই যাপন করতে হত যাযাবরের জীবন। কেননা খাদ্য ছিল প্রকৃতির যোগান নির্ভর। সেই যোগান তো অপর্যাপ্ত ছিল না। তাই, কিছুদিন পরপরই প্রাণী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি হতো খাদ্য শূন্য। খাদ্যের সন্ধানে তাই প্রাণী সমাজকে নতুন জায়গায় চলে যেতে হতো। এইভাবেই শ্যামলিমাময় বহু বনাঞ্চল হারিয়েছে তার শোভন শ্যাম রূপ। আদিম প্রাণী তা খেয়ে শেষ করে দিত। কোন রকম বাছবিচার করে খাদ্য গ্রহণ করার সম্ভাবনাই ছিলনা সেকালে।

এরপর বানরকল্প মানুষের যে প্রজাতিটি মানুষ হয়ে উঠলো তাদের কাছে এলো একটা বিশেষ সুযোগ। মানুষ হাত দিয়ে দেহভার বহনের কাজ পুরোপুরি পায়ের উপর ছেড়ে দিল। হাত নিয়োজিত হলো উৎপাদনের কাজে। হাত দিয়ে কাজ করতে গিয়েই তাকে মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হলো। হাত আর মাথা দুয়ে মিলে মানুষকে নানা সুযোগ এনে দিল। সে পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাতে পারলো। ক্রমে শিকার করতেও আরম্ভ করলো। এই পর্যায়ের আগে তাকে বনজাত খাদ্য গ্রহণ করেই বাঁচতে হয়েছে। শিকার করার পর মানুষ মাংস খেতে আরম্ভ করলো। সে মাংস কাঁচাই খেতে হতো। ক্রমে শস্য উৎপাদন, পশুপালন এবং আগুনের ব্যবহার শুরু হতে খাদ্যের যোগান হলো সুস্থিত। কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। আর সঞ্চয় করাও এসময়ের মানুষের জানা ছিল না। তাই খাদ্য গ্রহণ হতো যা পাওয়া যায় তাই খাও এই নীতি ভিত্তিক। কেবলমাত্র পরিপাক না হলেই কোন বস্তু অখাদ্য বলে বিবেচিত হতো। খাদ্য গ্রহণে কোন নিষেধ ছিল না। তা থাকা হতো অসম্ভব। আর নিষেধ করার মতো কোন শক্তি বা প্রতিষ্ঠানও ছিল না।

এটা সম্ভব হয়েছিল, কেননা 'ধর্ম'' বলে তখন কিছু ছিল না। ফলে খাদ্য গ্রহণে 'ধর্মীয়' বিধি নিষেধও ছিল না। যত্র আয় তত্র ব্যয়ের মত যা পাও তাই খাও এটাই ছিল নীতি এবং বাঁচার পথ।

এই সময়ের মানব সমাজে ধন-বৈষম্য শ্রেণী বা বর্গ ব্যবস্থাও ছিল না। সকলেই একই খাদ্য গ্রহণ করত। এমনকি ভোজনকালে বিভেদও ছিল না সেই বর্ণহীন মানব সমাজে। ভল্লুক, গজ, অশ্ব, শামুক সবই মানুষ খেত। তবে তা নির্ভর করতো আঞ্চলিক যোগানের উপর। যার যোগান বেশি ছিল মানুষ তাই বেশি করে খেত। হয়তো একারণেই মনু সংহিতায় শূকরের মাংস দিয়ে পিণ্ডদানের কথা বলা হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় মোষের মাংস খাওয়া হয় একালেও। এখনও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এবং বিশ্বের কোন কোন দেশে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়ায় কুকুরের মাংস খাওয়া হয়। ভারতে বহু মানুষ এখনও ব্যাং এবং গুগলি খাচ্ছে। ব্যাংতো বিশ্বের অন্যতম মুখরোচক এবং দামী আমিষ খাদ্য রূপে গ্রাহ্য। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ গ্রন্থে লিখেছেন,—"বৈদিক যুগে আর্যরা গো-হত্যা করে, তার মাংস অগ্নিতে নিক্ষেপ করে 'স্বাহা' উচ্চারণ করত। ঐ গো-মাংস আগুনে দগ্ধ করানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের আহার্য দেবতাদের নিবেদন করা।"

এই যুক্তিকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কেননা, বিবাহ এবং যৌন-আচারের ক্ষেত্রেও আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। স্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থা এবং যৌন জীবনে স্বামী স্ত্রীর যৌন-আনুগত্য সমাজে অনেক পরে স্থায়ী রূপ পেয়েছিল। এই প্রথা বহির্ভূত যে কোন সমাজ, যেমন মদ্রদেশীয় সমাজ, সর্বদাই সাহিত্যে উপহসিত হত। যে সকল জন-মণ্ডলী পূর্ব ব্যবস্থা অতিক্রম করতো তারাই পিছিয়ে পড়া সমাজের আচার ব্যবহারকে উপহাস করতো। অপরপক্ষে সমাজে প্রচলিত প্রথাকে দেবতাগ্রাহ্য বলে প্রচার করা হতো। এভাবেই প্রচলিত সমাজ বিধানকে লোকগ্রাহ্য এবং লোকমান্য করা হতো।

বৌদ্ধযুগের কথা উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক হবে এই প্রসঙ্গে। মহাবগ্‌গ বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয় পিটকের একটি ভাগ। মহাবগ্‌গের ভৈষজ্য স্কন্ধে ভল্লুক, মাছ ও শূকরের চর্বি দিয়ে ঔষধ প্রস্তুতের কথা উল্লেখ

করা হয়েছে। ঔষধের উপকরণ রূপে আদা, পেঁয়াজ, হলুদ ও নিম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এই সব উপকরণ জাত ঔষধ সর্বদাই দেহের বাহিরের অংশে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হতো না। সেবনের জন্যও ব্যবহৃত হতো। রাহুলজী এও উল্লেখ করেছেন যে. "বুদ্ধদেব বলেছেন—'রোগে কাঁচা মাংস খান ও কাঁচা রক্ত পান করুন।"

সমাজের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে পরীক্ষা করে বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে খাদ্য নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। সে সময়ের মানুষ ছিল পুরোপুরি অভিজ্ঞতা নির্ভর। চলতি প্রজন্ম তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে দেখে এবং শুনেই খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হতো। এই অভিজ্ঞতার উৎসরূপে কাজ করতো কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাপ্ত খাদ্য এবং যোগানের নিশ্চয়তা।

সভ্য মানব সমাজের প্রাথমিক বিন্যাসকে বলা হয় দাসতা যুগ। দাসতা যুগে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ধাতু মুদ্রা ব্যবহৃত হত ব্যবসায়। ভূমির উপর বর্গের অধিকার লোপ পেল। দাসের শ্রমে সমাজে পণ্য উৎপাদন হতো। এর পরের ধাপ হলো সামন্তবাদী যুগ। এই সময় ঐ ব্যবস্থাগুলি দৃঢ়তর হলো। মানব সভ্যতার শীর্ষে এলো মিশর, চীন, য়ুনানী ও ভারত। মিশরীয় সমাজ প্রসঙ্গে 'মানব সমাজ' গ্রন্থে লেখক বলেছেন, "মিশরীয়দের প্রাচীন ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমোদ প্রমোদের বিশেষ প্রকার বন্দোবস্ত হইত—এই সময় নেশা বা শরাবের কোনরূপ দুর্লভতা থাকিত না।' ভারত কিংবা অন্য দেশ যেটাই হোক সভ্যতা বিকাশের নির্দিষ্ট সময়ে সর্বত্রই দেখা যায় খাদ্য গ্রহণ ছিল আনন্দেরই উৎস। বিভেদ যা ছিল তা বর্গ সূচক। গরীব মানুষ সর্বদাই অতি সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতে পেত। সেটা বঞ্চনার জন্য। খাদ্যাচার কিংবা অন্য কারণে নয়।

ভারতীয় সমাজে উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব বেদের সময় থেকেই চলে আসছে। পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণকে মুখ, রাজাকে বাহু, বৈশ্যকে জঙ্ঘা এবং

শূদ্রকে পায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা আপসমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের সুযোগ সুবিধা ভাগ করে নিয়েছিল। ভোগে কারোরই অনিচ্ছা ছিল না। রাজার দান গ্রহণ তো ব্রাহ্মণের মর্যাদা বলেই বিবেচিত হতো। রাজা জনকের কাছ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের সহস্র গাভী গ্রহণ স্মরণীয়। বর্গ বিভাগ নিয়েই ব্যস্ত ছিল কনফুসিয় ভাবধারায় চালিত চীনের সমাজও।

ধর্মাচার থেকেই দেশাচার আসে। তথাপি ধর্মের নির্দেশে যেটুকু উদারতা পাওয়া যায় দেশাচারে তাও দুলর্ভ। খাদ্য প্রসঙ্গে বাইবেলের একটি কাহিনী উল্লেখ করার মত। সেন্ট পিটার কোন একদিন সাইমনের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখলেন স্বর্গ থেকে একটা কাপড় নেমে আসছে। সেই কাপড়ের গায়ে নানা জাতের পশুর চিত্র। পিটার শুনতে পেলেন কেউ যেন তাকে বলেছে, পিটার ওঠ, এই পশুগুলো হত্যা করে তুমি আহার কর। পিটার বললেন, 'না, আমি কখনো অপরিচ্ছন্ন কিছু আহার করিনি'। সেই স্বর তখন বললো, "ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাকে অপরিচ্ছন্ন বলো না।" খাদ্যে বাছ বিচার না করার কথাই বলা হয়েছে এই উপাখ্যানে।

মুসলমানদের খাদ্য প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। হামমুদাহ আবদালাতি লিখিত এবং মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, "ইসলামের রূপরেখা" গ্রন্থে খাদ্য প্রসঙ্গে ইসলামীয় নির্দেশ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,—"স্বভাবগতভাবে পবিত্র এবং মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বস্তুনিচয় মধ্যম পরিমাণে গ্রহণ করা পর্যন্ত খাদ্য হিসেবে বৈধ বা হালাল। পক্ষান্তরে অপবিত্র, অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর বস্তু নিচয় সকল সাধারণ অবস্থায়ই অবৈধ ও হারাম।" নিষিদ্ধ খাদ্য রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—"মৃত পশু ও পাখীর গোশত, শূকর এবং খোদা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাইকৃত পশুর মাংস"··· সর্ববিধ মাদক দ্রব্য, জুয়া ও লটারী নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। খোদার নামে ভিন্ন জবাই হলে মুসলমানগণ সে মাংস খাবেন না। এটি এবং যে সকল

সম্প্রদায় শূকরের মাংস খাদ্য রূপে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মাংসাহারে একটা বিভেদ থেকে গেল।

মান্না যে ঠিক কী খাদ্য তা স্পষ্ট নয় বাইবেলে। বলা হয়েছে মান্নার স্বাদ অনেকটা কেকের মত। ইহুদীগণ ইজিপ্ট থেকে ইজরায়েলে এসে ঈশ্বর প্রদত্ত এই মান্না খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহুদীদেরও আছে নিজস্ব আচার-বিচার। আঁশহীন মাছ ওঁরা খান না। দ্বি-খুর যুক্ত না হলে পশুর মাংস খাবে না, দুধ জাতীয় খাদ্যে মাছের ছোঁয়া লাগলে তাও ইহুদীরা খাবে না। মাংস খেতে হলে তাকে (পশুকে) বলিদান করে প্রসাদ করে তবে ইহুদীরা তা খাবে। এত নিয়মের জন্যই হয়তো ইহুদীরা, বাইরে এবং বিশেষ করে যারা ইহুদী নয় তাদের ছোঁয়া খায় না।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণে আচার বিচার এককথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন আহার গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব নিরামিষাশী। হিন্দু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু বৈষ্ণব বা শাক্তের আহারের মিল নেই। এমন কি নিরামিষ আহারেও বাছ-বিচার আছে। হিন্দু বিধবারা নিরামিষাশী। কিন্তু তারা মুসুর ডাল, চিচিঙ্গা খান না। ডিমের প্রসঙ্গ তুলছি না। হিন্দু ধর্মাচারের জন্য পঞ্জিকার নির্দেশ মান্য। পঞ্জিকায় বলা হয়েছে অষ্টমীতে নারিকেল এবং মাংসাহার নিষিদ্ধ। আমার অভিজ্ঞতা হলো, দুর্গাপূজায় নারকেলের নাড়ু অবশ্য দেয় এবং অষ্টমী তিথিতে দুর্গা পূজায় পাঁঠা বলি অন্য তিথি অপেক্ষা বেশী হয়। হয়তো 'ধর্ম' প্রসঙ্গে কোন বিশেষ বিধান আছে। আমার তা জানা নেই।

এসব বিধি পালন করেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু দেশাচারসম্মত যে স্পর্শদোষ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত তা মান্য করা এবং অসাম্প্রদায়িক থাকা অসম্ভব। এই স্পর্শদোষ দু'ভাবে দেখা যায়। প্রথমটি অন্য ধর্ম অনুসরণকারীদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি নিজেদের মধ্যে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গে মেলামেশায়

মান্য। প্রথমটির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে ধর্মীয় আচার পালনে এবং আহার গ্রহণকালে ছুঁলে স্পর্শদোষ হয়। এতে আন্তঃ সাম্প্রদায়িক বিভাজন স্থায়ী হয়েছে। অপর পক্ষে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী বলে পরিচিত হিন্দুদের স্পর্শকে সর্বদাই দোষ বলে মনে করা হয়। এর ফলে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে। হিন্দুরা জাতিরূপে কখনো কোন কাজ করতে পারে না এই স্পর্শদোষজনিত বিভেদের জন্য।

খাদ্য গ্রহণকালে স্পর্শদোষের এক উৎকট এবং হাস্যকর উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ: মোটরের চালক মুসলমান তাই তার মালিক মোটরে পানও খাবেন না। দ্বিতীয় একটি ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এক হিন্দু বাড়ির দাওয়ায় জনৈক মুসলমান দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়ির মালিক জল পান করবেন। তাই তিনি ঐ মুসলমান ভদ্রলোককে দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়াতে বললেন। একই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জলপানও চলে না যাদের সঙ্গে, কতদিন তাদের সঙ্গে এক দেশে বসবাস করা যাবে!

হয়তো দেশ শাসনের জন্য ইংরেজ এই বিভেদের সুযোগ নিয়েছে। তাই বলে একথা বলা হবে ভুল যে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কারণ হলো ইংরেজের নীতি। যদি ইংরেজের নীতি সাম্প্রদায়িকতার কারণ হতো তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্প্রদায়িকতা থেকে আমরা মুক্তি পেতাম। কেননা কারণ-ব্যতিরেকে কার্য হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

খাদ্যে স্পর্শদোষজনিত একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি ব্যক্তি মানুষকে খুব কমই প্রভাবিত করে। মানুষ দলবদ্ধ হলেই সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি তাকে বিপথে চালিত করে। দেশ বিভাগের সেই দুঃসময়ের কাহিনী এটি। সাবেক পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানগণ দীর্ঘ দিনের আত্মমগ্ন ভাবের খোলসটা

ছেড়ে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি। সাবেক পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মেলামেশা ছিল অবাধ। মুসলমানগণ কৃষিকাজ দুধ বিক্রী, শিউলির কাজ, এই ধরনের কায়িক পরিশ্রমের কাজ করত বেশী। হিন্দুদের বাড়িতে দুধ সরবরাহ করাও এদের একটা বড় কাজ ছিল। এরকমই একজন দুধ বিক্রেতা ছিলেন ফিরোজালি (ফিরোজ আলি ?)। তিনি ছিলেন হিন্দু বাড়ির শিশুদের কারো কাকা কারো জ্যাঠা। বাড়ির মহিলাদের তিনি বলতেন মা বা বইন (বোন)।

ফিরোজালির বোনেদের ইচ্ছা হলো তাকে একদিন খাওয়াবে। সে রাজী হলো একটি শর্তে, মাংস দেওয়া চলবে না। ফিরোজালিকাকা তার ছেলেকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে খেয়ে গেল। বারান্দায় দরজা বন্ধ করে তাকে খায়ানো হলো গোপনে। এবার এলো ফিরোজালিকাকার দিক থেকে আমন্ত্রণ। তিনি বাড়ির সকলকেই নিমন্ত্রণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ির সকলেই ফিরোজালিকাকার নৌকায় উঠে বসলো। হালকা বাতাসে প্রথমে খাল বেয়ে পড়ে জমির মধ্য দিয়ে ফিরোজালি-কাকার নৌকা চললো তির তির করে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ তখন সাধারণভাবে একটু নিচু এলাকায় বাস করতেন। নৌকা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের বিলে পড়তে বিপরীত দিক থেকে আসা নৌকার মুখোমুখি হলো। সেই সব নৌকার মাঝিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করছিল, "এদিগরে কমনে যাও মাঝি ?" ফিরজালিকাকা বলে চলছিল, 'মেহমান' ঐখানেই তাদের উৎসাহ শেষ। ফিরজালিকাকার বাড়িটি তার দুধ ক্রেতাদের বাড়ি থেকে বড়। বেশ বড় উঠোন। তাতে উনুন কাটা। বার বাড়িতে একটা খোলা চালওয়ালা ঘর। তাতে বসার চৌকি আছে। তার বসবাসের ঘর টিনের চালওয়ালা। সে সময় টিনের চৌচালা ঘর সচ্ছলতার প্রতীক ছিল। ফিরোজালিকাকার টিনের ঘর। সামনে বারান্দা। একপাশে আলাদা রান্নাঘর। তারপাশে গোয়াল আর মুরগীর খাঁচা। ফিরোজালিকাকার ভিতর ঘরে মেয়েরা চলে গেলো। ভেতরে উচ্ছল হাসির ফোয়ারা। বইন বইন শব্দটাই বার

যার শোনা যাচ্ছিল। মেয়েদের হাসিতে, হিন্দু-মুসলমানের হাসি বলে কিছু ছিল না। ছিল আনন্দের অভিব্যক্তি।

ফিরোজালিকাকার বাড়িতে বারান্দায় নানারকম ছবি ছিল। আর ছিল কাপড়ে ছুঁচের কাজের কিছু লেখা বাঁধানো। সে সময় এটার খুব চল ছিল। প্রায় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়িতে দেখা যেত 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' ইত্যাদি ছুঁচের কাজের লেখা বাধিয়ে অন্যান্য ছবির পাশে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। এমনি একটা ছবিতে লেখা ছিল। 'ওরে মুসলমানের ছেলে, কাজ করিলে জাতি যায় কোন হাদিসে বলে!" দুই সমাজের জীবনভঙ্গি এতেই ধরা পড়লো। একদল ভাব নিয়ে থাকতে চায় অন্যদল বাস্তববাদী।

দুপুরে চিনেমাটির বাসনে খাওয়াদাওয়া হলো। তারপর ফিরোজালিকাকা পাড়ার মাতব্বরদের (প্রধান) ডাকলেন। তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গে আরো লোক এলো। হাতে তাদের বড় বড় লাঠি আর তলোয়ার। একটু অবাক হওয়ার মতই ঘটনা বটে। দেখলাম অনেক শিশু কিশোরও জমা হয়েছে। কথার মাঝেই বেজে উঠলো একটা বড় কাঁসার থালারমত কিছু। শুরু হলো লাঠি আর তলোয়ার খেলা। সূর্য ঢলে পড়তে আবার আমরা নৌকায় উঠলাম। ফিরোজালিকাকা আমাদের পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসবেন। কখন সে ফিরবে কে জানে?

কারো জাত গেলো না। কিন্তু কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা—হিন্দু-মুসলমানে একসঙ্গে খাওয়া ছিল অসম্ভব। আসলে খেলে ছুঁলে জাত যায় না। সমাজপতিদের আচার তথা অধিকার ভাঙ্গলে জাত যায়। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার খাদ্য বিচার এবং খাদ্যে স্পর্শদোষ। সমাজপতির অধিকার হলো সমাজ পরিচালনার অধিকার। সেই অধিকার রক্ষার জন্য উদ্ভাবিত হয় সম্প্রদায়, ধর্ম, সমাজনীতি, স্পর্শদোষ এবং খাদ্য বিচার। কৈশোর থেকে বলে বলে প্রত্যেকের মধ্যে তা অনুসরণ এবং পালনের একটা অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। সেই অভ্যাসের বোঝা বয়ে চলাই জনগণের ভবিতব্য।

খাদ্য বিচারের দ্বারাই খাদ্য বিভেদ জনিত আচার শেষ করা হয়নি। খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি এবং উপকরণেও বিভেদ রাখা হয়েছে। খাবারের পাত্ররূপে কলাপাতার ব্যবহার বাঙালী সমাজে প্রচলিত। মুসলমানরা কলাপাতার নিচের দিকে এবং হিন্দুরা উপর দিকে খাবার রেখে খায়। এ নিয়েও চলে দুই সম্প্রদায়ের উতোর চাপান। এখন খেলেও, নিকট অতীতে হিন্দুরা মুরগি খেত না। মুসলমানরা মুরগি পুষত এবং তার ডিম ও মাংস খেত। এনিয়েও আছে বিদ্রূপাত্মক প্রবাদ। পশু মুসলমানরা জবাই করে কিন্তু হিন্দুরা বলি দেয়। এটাও বিভেদের কারণ হয় কখনো কখনো। বিতর্কের বিষয় হলো, 'বলি' না 'জবাই' কোনটা কম ক্লেশদায়ক। এই বিতর্কের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হিন্দুদের কচ্ছপ কাটা। পশুক্লেশ নিবারণের সমস্যা তাহলে সহজ হয়।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক এই বিভেদ খাদ্য গ্রহণ, তাকে খাদ্যোপযোগী করার পদ্ধতি এবং স্পর্শজনিত কারণে ঘটে বলে বলা হয়। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পর্শ দোষের প্রথা হিন্দু সমাজেই দেখতে পাওয়া যায়। একারণেই খাদ্য প্রসঙ্গে 'মন' নিয়েও টানাটানি কম হয়নি। রামানুজাচার্য খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি, উত্তেজনা আনতে পারে এমন খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, যিনি খাবার প্রস্তুত করবেন তাকে মনে এবং চিন্তায় পবিত্র হতে হবে। তাঁর তৃতীয় বিধান হলো, পচা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শেষের দুটি, বিশেষ করে দ্বিতীয় নির্দেশটি মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। একারণে প্রচলিত হয়েছে স্পর্শদোষ। স্পর্শদোষ প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের একটি গল্প আছে। গ্রাম বাংলায় রজকিনীদের উচ্চবর্ণের মানুষের বাড়িতে কিছু কিছু কাজ করতে হতো। এমনি এক রজকিনী কাজের সময় গৃহকর্তার খড়মে পা লাগিয়ে বসে। কুপিতা গৃহিণী রজকিনীকে যারপরনাই তিরস্কার করে। গৃহকর্তা ছিলেন, রজকিনী প্রেম নিকষিত হেমে বিভোর। রাতে কর্তা মশাই রজকিনীর ঘরে বসে। রজকিনী তার পাদুটি কর্তার কোলে তুলে পরম সন্তোষে সেবা নিচ্ছে। এরকম

ঘটনা আখছাড় ঘটতো। স্পর্শদোষ হতো না এতে। আমাদের সমাজ জীববিজ্ঞানসম্মত পথে চলতে চায়না বলেই এই স্ববিরোধিতা।

হিন্দুর জীবনে স্পর্শদোষ খাদ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁহলো হিন্দুর জীবনচর্চার অঙ্গ। বাবাসাহেব আম্বেদকর এই স্পর্শদোষজনিত কারণে সীমাহীন যন্ত্রণা, অপমান এবং লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তিনি ছিলেন তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী বলে পরিচিত মাহার সম্প্রদায়ের লোক। তিনি সর্বাধিক যোগ্য প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও মাহার হওয়ার অপরাধে, অধ্যাপক পদে প্রথম বিবেচিত হন নি। ছোট লাট সিডেনহামের প্রচেষ্টায় তিনি বোম্বের সিডেনহাম কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সহকর্মী অধ্যাপকগণ, আম্বেদকর নিম্নবর্ণের লোক বলে, তাকে অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট কলসী থেকে জল দিতে অস্বীকার করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় যা পেত তাই খেত। আজ আর এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। চলবেও না। খাদ্যগুণ প্রসঙ্গে মানুষের জ্ঞান আজ প্রায় পূর্ণতা পেয়েছে। তাই একালের আহার হবে সুষমখাদ্য যা নির্দিষ্ট ক্যালরিযুক্ত। খাদ্য কেবল পুষ্টিকর হলেই হবে না। তা হবে সহজপাচ্য। ফলে খাদ্য বিচার সম্প্রদায়গত নয়। হবে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মাফিক। গুরুপাক দুধ এবং মাংস একারণেই একসঙ্গে খাওয়া হয় না।

সমাজে বর্গ ব্যবস্থা কায়েম রাখতেই সমাজপতিরা খাদ্য-বিচার ব্যবস্থা প্রচার করেছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ যেন বঞ্চনা বুঝতে না পারে। ধর্ম যখন থেকে জীবনযাপনে নিয়ন্তার ভূমিকা নিল তখন থেকেই খাদ্যে স্পর্শ ও অন্য দোষ বিচার শুরু হয়। ধর্ম এবং লোকাচার রক্ষায়, ধর্মের কাছে দর্শনের দাসত্ব বহুদিন ধরেই চলে আসছে। খাদ্য নির্বাচনেও এর অন্যথা হয় নি।

মাংসাহার নিয়েও হিন্দুরা স্ব-বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনু বিধান দিয়েছে, কোন কোন অনুষ্ঠানে মাংস না-খেলে পরজন্মে পশু হতে হবে। যজ্ঞের সঙ্গে মাংস শব্দ তো প্রায় সমার্থক ছিলো একদা।

অথচ হিন্দুদের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না। আবার অনেকে বন্য মুরগি খেলেও গৃহপালিত মুরগির মাংস এবং তার ডিম এক সময় খেত না। বর্গ ব্যবস্থার ফলে এই রকম একটা ব্যবস্থা চলে আসছে হয়তো। কেননা, উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে বিধি মান্যতা অপেক্ষাকৃত শিথিল। কিন্তু নিম্নবর্ণ তথা বর্গের ক্ষেত্রে এই বিধি এবং আচার পালন অবশ্য কর্তব্য।

বর্ণের নামে বর্গ ভেদ গীতায়ও সমর্থিত হয়েছে। জ্ঞান যোগ শিক্ষাদানের সময় কৃষ্ণ এও বলেছেন—

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম ॥'

গুণ এবং কর্ম বলতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত শম, দম; ক্ষত্রিয়ের জন্য শৌর্য-বীর্য এবং বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্য ও শূদ্রের কর্ম উচ্চ-বর্ণের সেবা করা! প্রসঙ্গটি নিখুঁতভাবে বলেছেন ভাববাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা প্লেটো। প্লেটোও তার আদর্শ সমাজে বর্গ বিভাজন করেছেন। তিনি তাদের কর্মও নির্দেশ করে দিয়েছেন। প্লেটোর মতে, প্রতিটি মানুষের দেহের মৌল উপাদান হলো মাটি। মাটির সঙ্গে সোনা রূপা ও পিতল-লোহা মিশেল দিয়ে তৈরী হতো যথাক্রমে: রাজা বা শাসক, শাসন সহায়ক যোদ্ধা এবং কৃষি ও সেবামূলক কাজের জন্য শূদ্র শ্রেণী।

এই বিভাগ নিম্নবর্গের মানুষ কেন মেনে নেবে? প্লেটো বলেছেন, এই বর্গ-বিন্যাসের কথা শিশু শিক্ষায় যুক্ত করতে হবে। শৈশব থেকেই প্রতিটি শিশুকে এই বর্গ বিন্যাসের কথা প্রতিদিন শোনাতে হবে। কথাটা শুনতে শুনতে এটা বিধাতার দান বলে তারা মেনে নেবে। এজন্য শিক্ষার ভাষাকে করতে হবে ব্যঞ্জনাময় এবং লালিত্যযুক্ত, যা সহজেই মনোহরণ করবে শিক্ষার্থীর। একই কায়দায় খাদ্য গ্রহণের বিধি নিষেধগুলো প্রচার করতে হবে। প্রচারের মাধ্যমে খাদ্য বিচার ও স্পর্শ দোষের বোধটা চেতনায় স্থায়ী করে দিতে হবে। যাতে বংশ

পরম্পরায় নির্দিষ্ট বর্গের সকলে এটা মানে। তার জন্য বর্গের মধ্যে বিবাহ বিধিও প্রচলন করা হলো। নিশ্চিত হওয়া গেলো। শূদ্রের ছেলে শূদ্রই হবে। সে শূদ্রের খাবার খাবে এবং শূদ্রের মতো আচরণ করবে। এর সঙ্গে ভাববাদী উচ্চবর্ণের প্রধানগণ শব্দের সঙ্গে অনুষঙ্গ যুক্ত করে দিলেন। ফলে উদ্দিষ্ট ভাবটি নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে প্রচারও সহজ হয়ে গেলো। স্বায়ী হলো সম্প্রদায়। একে জোরদার করার জন্য সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলে। যাতে করে মানুষ কিছুতেই না ভুলতে পারে তার সাম্প্রদায়িক পরিচয়। স্থায়ী হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এই ভাবে।

বিবাহ প্রথার বিবর্তনে মোলবাদের প্রভাব

বিবাহ এবং পুরোহিত শব্দদুটি এখন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন ধর্ম সম্প্রদায় যদি কখনো গড়ে না উঠত কিংবা একজনও পুরোহিত যদি না থাকত তবুও বিবাহ বা তার সমগোত্রীয় কোন ব্যবস্থা অবশ্যই প্রচলিত হতো। বিবাহের মন্ত্র তো বিবাহের জন্য অপরিহার্য নয়। এমন কি কখনো যদি কোন ভাষাও সৃষ্টি না হতো তবুও নর-নারীর মিলনে বাধা হতো না। নর-নারীর সম্পর্ক ভাষা, ধর্ম, মন্ত্র কিংবা পুরোহিত নির্ভর নয়। সমাজ বিবর্তনে বিবাহ এবং বিবাহের বিবর্তনে সমাজ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। তার কারণ ধর্ম নয়। তার অনুঘটক নয় পুরোহিতগণ।

সমাজ বিবর্তনের অন্যান্য উপাদান হলো বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং মানবিকবাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বস্তুগতির মতই মানব মনও কখনো স্থির থাকেনা। মন এবং বাস্তব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই সমাজ বিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনও এভাবেই হয়েছে। ধর্ম নয়, মানুষের প্রয়োজনেই ফরাসী বিপ্লব কিংবা সোভিয়েত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একারণেই, ধর্মাচার অনুমোদিত অনেক নির্দেশই একালে আর মান্য করা হয় না। খ্রীষ্টভক্তরা বলতেন, পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট দিনে সৃষ্টি হয়েছে। সেকথায় আজ আর কোন স্কুল-ছাত্রও গুরুত্ব দেয় না। প্রাচীন হিন্দুমতে গ্রহণের যে কারণ উল্লেখ করা হয় তাও আজ উপেক্ষিত। উপহসিত।

সত্যকে জানার চেয়েও কঠিন কাজ হলো জীবনে তার প্রয়োগ করা। বিবাহ, মিলন এবং সন্তান উৎপাদন ধর্ম চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মাচার বিবাহকে স্থায়ী করেনা কিংবা শান্তি অথবা সুখের উৎস-রূপে কাজ করেনা। ধর্ম ব্যাপারটা কোন একজন না জেনেও বিবাহ করতে পারেন। ধর্মসাক্ষীকরে বিবাহের মতই তা স্থায়ী বা ভঙ্গুর হতে পারে। উভয় বিবাহেই সন্তান উৎপন্ন হবে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ণ

স্বাভাবিক হয়। এটা জেনেও বহু মানুষ ধর্মীয় আচার মেনে চলে। নিজ নিজ ধর্মীয় সংঘের আচার-বিচার প্রসঙ্গে বিরূপতাও প্রকাশ করেন। এভাবেই ধর্মীয় বর্গীকরণ শুরু হয়। ক্রমে তা বিরোধ এবং বিদ্বেষের রূপ নেয়। এই বিদ্বেষ থেকে আসে সংঘাত। এই ভাবেই নিজ নিজ ধর্মাচারকে তারা আরো বেশী করে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। পুরোহিতরা এই মানসিকতা স্থায়ী করার জন্য বিধি নিষেধ বাড়িয়েই চলে। এই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বিবাহ ব্যবস্থায় প্রকট। বিবাহ যেহেতু সভ্য সমাজের যৌন মিলনের বিধি সম্মত পথ তাই এর স্বরূপ, প্রভাব এবং প্রয়োগ পদ্ধতি না জানলে মৌলবাদের স্বরূপও অজানা থাকবে।

সামাজিক প্রগতির জন্য নর-নারীর মিলনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো বিবাহ প্রথা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির মিলনে, বিবাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহের মাধ্যেমে সৃষ্টি হয় মুক্ত-বন্ধনের। কবিতার ছন্দের মত। এহলো উল্লাসের বিধি-বিধান। যৌন জীবনে বিকার প্রতিরোধ করে বিবাহ প্রথা। মানুষকে সামজিক ভাবে দায়বদ্ধ করে বিবাহ প্রথা। এই দায়বদ্ধতা পরিণামে সমাজ গঠনের উপাদান রূপে কাজ করে। বিবাহ প্রথা এবং যৌন জীবনের বিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয়। মানব সমাজের প্রাথমিক বিকাশ গতির সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ গতি বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হবে।

মানব-সমাজের বিকাশের ধারাকে ত্রিস্তর বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। তিনি এই স্তরগুলিকে আখ্যায়িত করেছেন, বন্যমানুষ, বর্বরমানুষ এবং সভ্যমানুষ রূপে। বন্যমানুষ পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে এসেছে। আদিতে পৃথিবী ছিল একটি প্রজ্জলন্ত বাষ্পপিণ্ড। তারপর অনুগুচ্ছ এলো। এলো জীবানু বা ভাইরাস, ব্যাকটীরিয়া এবং আমীবা। এরও অনেক পরে এলো স্তন্যপায়ী জীব। এদের থেকেই এলো বানর এবং কোন একটি বানরের প্রজাতি থেকে এলো মানুষ। এও বিশলক্ষ বৎসর আগের কথা। মানুষের হাতে

প্রথম অস্ত্র আসার ইতিহাসও দশলক্ষ বৎসরের। আধুনিক মানবের আকৃতির সঙ্গে মিল আছে বলে মানবের যে প্রজাতিটিকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে তাদের নাম সপিয়ন মানব। এরাও বেঁচেছিল আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে।

রামায়ণের রচনাকাল ধরা হয় আড়াই থেকে তিন হাজার পূর্বে। কত পথ আর কতকাল হাঁটতে হয়েছে আধুনিকতায় পৌঁছতে এই মানুষকে। প্রথম তারা একা কিংবা আর একটি নারীর যোগে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছে। তারপর সন্তান পালনের দায় নিয়েছে মানুষ। অনেক পরে মানুষকে 'মানুষ' করার দায়ও সে বহন করেছে। এই ভাবে হলো যূথের সৃষ্টি। এই যূথবদ্ধ মানুষ গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্র গঠন করেছে। পৃথিবীর অনেক কিছুই মানুষ বদলে দিয়েছে। এই বদলে দেওয়ার ক্ষমতাই তাকে মানুষ করেছে। স্মরণরাখা দরকার যে, এই বদলে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাকেই বলে মানুষ হওয়া। মানুষকে তাই মানুষ হতে চেষ্টা করতে হয়। পশুকে পশু হবার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না। পৃথিবী বদলে দেওয়ার কাজে মানুষের প্রথম ও প্রধান সহায়ক 'হাত' ও 'মস্তিষ্ক'।

সেই প্রথম যুগের মানুষের সময় কেটেছে ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবারণে। সেকালে উদবৃত্ত সম্পদ বলে কিছু ছিল না। তাই সঞ্চয় বলেও কিছু ছিল না। থাকতে পারেও না। কিন্তু যৌন মিলন ছিল। যেমন আছে এখনও পশু সমাজে। মানুষ মস্তিষ্ক এবং হাতের ব্যবহারে অন্য প্রাণীকে টেক্কা দিল তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। দলবদ্ধভাবে থাকতে হলে কিছু কিছু নিয়ম-কানুন মানতেই হয়। নিয়ম মানলেই সৃষ্টি হয় সমাজের। সমাজ হলো এক সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্য সম্প্রদায়—যাদের শ্রমশক্তি পরস্পর নির্ভর।

সভ্য মানব সমাজও একাধিক স্তর বিশিষ্ট। একেবারে প্রাথমিক অবস্থাকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজ। এই সময় সঞ্চয় বলে

কিছু ছিলনা। সমাজের মধ্যে কোনরকম শ্রেণী বিভাগ ছিলনা বলেই এই নাম। এই সময় থেকেই বিবাহের একটা ছক লক্ষ্য করেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। তিনি একে বলেন যূথ বিবাহ। একটি যূথের প্রতিটি নারী ঐ যূথের প্রতিটি পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যে-কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনে অধিকারী ছিল। এই যৌন সম্পর্ক খুবই শিথিল বলে মনে হতে পারে একালে। আসলে যৌন সম্পর্কের বিধি-বিধান কিন্তু এই সময় থেকেই গড়ে উঠে। যূথের মধ্যে যৌন সম্পর্কে বাঁধা নেই ঠিকই। কিন্তু যূথের বাইরে এই সম্পর্ক গর্হিত এবং নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হত। আধুনিক বিবাহিত জীবন যেমূল্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটা ক্ষীণ ছায়া আমরা আদিম সাম্যবাদী সমাজে দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো মাতৃতান্ত্রিক যুগ।

পরবর্তী পর্যায় এলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে আদিম সাম্যবাদ রইলো না। দেখা দিল বংশ পরিচয়। একটি পরিবার একটি বংশ, এই ধারণা গুরুত্ব পেতে থাকল। জনযুগে এই ব্যবস্থাই গ্রাহ্য হলো। এই যে 'জন' বা 'গোত্র' ব্যবস্থা তা সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগের কথা। 'জনপদ' গড়ে উঠার সময় এটা। গোত্রের নাম থেকেই জনপদ নাম পেত। ভাষার লেখ্যরূপ 'লিপি' তখনও সৃষ্টি করতে পারেনি মানুষ। আধুনিক জীবনও বিকশিত হয়নি। যৌন জীবনে কিন্তু নানা বিধি-নিষেধ এলো। এতদিন ছিল সদর্থক নির্দেশ। এই সময় থেকে এলো নঙর্থক নির্দেশ। জনযুগেই ঠিক হলো সমগোত্রে বিবাহ হবেনা। নিষিদ্ধ হলো মাতা-পুত্র, পিতা-পুত্রী এবং ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ। যদিও এর ব্যতিক্রম ছিল আখছাড়। মহাভারতের শ্বেতকেতুর কাহিনী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতিথি ঋষি শ্বেতকেতু পিতার সামনেই মাতাকে সহবাসের জন্য নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এর প্রতিবাদ করলে পিতা একে ধর্মাচার বলেন। শ্বেতকেতু পরে এই প্রথা তুলে দিয়ে এক বিবাহ প্রথা এবং যৌন আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে (সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বসুমতী প্রকাশিত) গল্পটি এইভাবে বলা হয়েছে—

"পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাছারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমরাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগযোণিগত কামদ্বেষ বিবর্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রমাণিক ধর্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে।

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতা-মাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস আমরা যাই।' ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! ক্রোধ করিওনা, ইহা নিত্যধর্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মে লিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য মধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তরে সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যা সদৃষ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে।'.........পূর্ব্বকালে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।"

সম্পত্তি এবং সঞ্চয় প্রসঙ্গে, আবার ফিরে আসা যাক।

সঞ্চয়ের ফলে মানুষ নিয়মিত আহার্য সংগ্রহের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। এই মুক্তি মানুষকে সুযোগ দিল সভ্যতা বিকশিত এবং লালন করার। বিপরীতক্রমে, এই সঞ্চয় থেকেই এলো বলবানের শোষণ এবং শাসন। সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাখ্যা সে সময় মানুষের অজ্ঞাত ছিল। তাই মানুষ সহজেই ভয় পেত। ভয় থেকে এলো ইন্দ্রজাল। যা অতিশক্তি কিংবা প্রাকৃতিক কারণে ভয় পাওয়া মানুষকে ভুলিয়ে সুযোগ নিত। এই অতি শক্তির ধারণা থেকেই এলো তাকে তুষ্ট রেখে শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করার কল্পনা। এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে সেকালের কিছু কিছু বুদ্ধিমান এবং সামান্য যাদু জানা মানুষ। এরা কল্পিত অতি শক্তি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেছে। এই অতি শক্তির ধারণাকেই এরা দেবতায় রূপান্তরিত করেছে। প্রচলন করেছে ধর্মের ধারণা। এই সম্প্রদায় অবশেষে পুরোহিত বলে পরিচিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এরা নিজেদের স্বার্থে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছে। এরা জোয়ার ভাঁটার সময় নিরূপণ করে প্রচার করেছে পূর্বাভাস। প্রচার করেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা তারা জানে বলেই এটা বলতে পারছে। এরা মিশরে পিতর এবং মহাপিতর নামে খ্যাত।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়ও বিবাহ প্রথা ছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা এমন ছিল না যে বিবাহের পর কেবল মাত্র স্বামীর সঙ্গেই সহবাস করা যাবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রচলিত হলো তখন গৃহকর্মের দায়িত্ব পেল মহিলারা আর বাইরের শিকার, ফলসংগ্রহ প্রভৃতির দায় বহন করতে হলো পুরুষকে। এরপর যখন বীজরক্ষণ ও চাষের কাজ শিখল মানুষ তখন পুরুষের হাতে আরো ক্ষমতা এলো। শস্য সংগ্রহ করে গুদাম জাত করা, পশুপালনের মাধ্যমে মাংসের যোগান দেওয়া এবং দুগ্ধ সরবরাহের নিশ্চয়তা নারীকে আরো গৃহবন্দী করল। নারীও এই সময় থেকেই সম্পদ হয়ে উঠলো। পুরুষ দীর্ঘদিন বহু বিবাহের অধিকার রক্ষা করেছে। এখনো তা লোপ পায়নি সর্বত্র। কিন্তু মহিলাদের জন্য

ববস্থা হলো একপতির। স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহের অধিকার এখনো মহিলাকে সকল সমাজ দেয় না। নারীর ক্ষেত্রে যৌন আনুগত্য জরুরী। পুরুষের জন্য পত্নী, উপপত্নী এবং বারবণিতার ব্যবস্থা রাখা হলো। বারবণিতা প্রথা আইনসম্মত এখনো।

দাসযুগে এক বিবাহ ব্যবস্থা আরো দৃঢ়বদ্ধ হলো। কিন্তু দাসী, বারবণিতা এবং উপপত্নী ভোগের ব্যবস্থা পুরুষের জন্য রইলোই। হিন্দু কিংবা মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ কখনো নিষেধ করা হয়নি। কৃষ্ণ কিংবা দশরথের কথা আমরা ভাবতে পারি। লক্ষ্য করার মতই ঘটনা যে, সমাজ যত দানা বাঁধছে নারীর যৌন অধিকার তত কমছে। নারীর অধিকার হরণে ধর্ম একটা ভূমিকা নিচ্ছে। স্মরণ করা যায় মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম-ধারণা ছিল না। প্রাচীনকালে মাতা-ভগ্নী ইত্যাদি রূপে নারীর এবং পিতা কিংবা ভ্রাতারূপে পুরুষের কোন পরিচয় ছিল না। যৌনাচার ছিল বিধানের বাইরে। পরাশর-সত্যবতী, দীর্ঘতমা ঋষির কাহিনী, শর্মিষ্ঠা-যযাতি কিংবা উলূপী-অর্জুনের কাহিনী এই ব্যবস্থার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উতঙ্কের গুরুপত্নী গমনকেও পাপ বলা হয়নি।

চন্দ্রমা গুরুপত্নী বৃহস্পতির স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে বুধের জন্ম হয়। পিতৃত্ব নিয়ে তীব্র বিরোধে জড়িয়ে পড়ে গুরু ও শিষ্য। একটা কথা বেশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, যৌনাচার এবং বিবাহব্যবস্থা ধর্ম-ধারণার চেয়ে প্রাচীন এবং তা ছিল বিধি-নিষেধ মুক্ত। কিন্তু মানুষ তার কর্মের পরিণতির প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। ধর্ম আপন প্রয়োজনে বিবাহে বিধি যুক্ত করে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নেয়।

বিবাহ এখন ধর্মীয় আচারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। শ্বেতকেতুর সময় থেকে যদি আধুনিক বিবাহব্যবস্থার শুরু ধরা হয় তবে বিবাহের ইতিহাস কম বেশী আড়াই হাজার বছরের। কিন্তু মহাভারতের যুগেও কী বিবাহপ্রথা তেমন কঠিন বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত ছিল? কুমারী কুন্তীর পুত্র কর্ণ, কুমারী গঙ্গার পুত্র ভীষ্ম, কুমারী সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব। এরা

অনেকে পরবর্তী জীবনে বিবাহ করেন। এছাড়াও প্রচলিত ছিল নিয়োগ ও ক্ষেত্রজ প্রথা। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই নিয়োগ-সন্তান। ধর্ম এসব মেনে নিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসীরা বলেন, ধর্ম শব্দটি এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ ধারণ করা। অবশ্যই ধর্ম ধারণ করে। যদিও তা বলবানের ইচ্ছাকে। ধর্ম ধারণ করে শোষণকে। ধর্ম ধারণ করে শোষিতের নিঃস্ব জীবনকে। এর প্রতিকার ইচ্ছা ধর্ম ধারণ করতে পারে না। করেও না।

বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তাই শক্তের অত্যাচার প্রতিকারের বদলে, প্রতিরোধের বদলে, প্রচলিত হয় দেবতুষ্টির বিধান। বলিদান একালের প্রথা। দেব-তুষ্টির জন্য পূজা বা বলিদান গরীবকে আরো গরীব করে। তথাপি প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, অসহায়তা প্রতিকারের পথ না পেয়ে, জনতা ধর্মাচার এবং দেব তুষ্টির সহজ পথটি বেছে নেয়। ধর্মকল্পনা দৃঢ় করতে পুরোহিত এবং তার পশ্চাতে ছিল ধনিক শ্রেণীর সহায়তা।

বৈবাহিক সম্পর্কের বিবর্তন এটা প্রমান করে যে ধর্ম কল্পনা মাত্র। যৌন সম্পর্ক মানব মানবীর আদিমতম সম্পর্ক। যূথ-যৌন সম্পর্ক এরই প্রমাণ দেয়। ধীরে ধীরে আসে পতি-পত্নী সম্পর্ক। কিন্তু সভ্য মানব সমাজে যখন পতি-পত্নী সম্পর্ক স্থায়ীরূপ নিচ্ছে তখনও দেব-ভূমিতে বহুভোগের ছড়াছড়ি। সম্ভবতঃ দেব কল্পনায় মানবের অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। পর জন্ম, পূর্বজন্ম এবং স্বর্গ ও নরকের কথা বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম-চিন্তা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থাবান করে তোলা হয়েছে। কোন ধর্মই প্রথম দিকে মৃত্যুর পর আবার মনুষ্য জন্মের কথা বলেনি। বর্তমান জন্মের কর্মফলেই মানুষের স্বর্গ কিংবা নরক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। উপ্‌নিষদেই বলা হয় পূর্ব জন্মের কর্মফলেই বর্তমান জন্মের সুখদুঃখের কারণ। এরপর আর ধনবানকে গরীব কিছু বলতে পারে?

ভোগের প্রয়োজনে ধনী নীতি-নিয়ম গড়ে তুললো। যৌন-ভোগ

এবং তার জন্য নীতি-নিয়মত এইভাবেই এসেছে। মাতৃতান্ত্রিক যুগে যৌন-জীবনে পুরুষ-মহিলা সম অধিকার ভোগ করেছে যূথ এবং মিথুন বিবাহ এই সত্যই প্রকাশ করে। পিতৃতান্ত্রিক বিশেষ করে সামন্ত যুগে এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত হলেও তা ধনী পুরুষের জন্য মান্য ছিল না। এই কাজটা ধর্মের নামে হতে থাকলো। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, স্ত্রী-জাতি কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে। স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট হলো; সতী প্রথা, বৈধব্য এবং পতিত্যাগে অসম্মতি। যদিও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সমাজের মহিলারা ধর্মের এই বিধানে শাসিত নয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিবাহ বিচ্ছেদে অনুমোদন দেয় না। বিধবা বিবাহ উভয় ধর্মেই মান্য। যদিও উচ্চবর্ণের মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ নেই বললেই চলে।

মহাভারতের একটি ঘটনা না বললেই নয়। দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে লাভ করে পঞ্চ-পাণ্ডব দীর্ঘদিন তার সঙ্গে সহবাস করার পর দ্রুপদ রাজার গৃহে ফিরে যায় দ্রৌপদীকে যজ্ঞ ও মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য। মনে হয় সে সময় যজ্ঞানুষ্ঠান, মন্ত্র পাঠ এবং সপ্তপদী গমনের মাধ্যমে হিন্দু বিবাহ প্রথা সমাজ গ্রাহ্য হয়ে ছিল। পাণ্ডবেরা সমাজ মান্য কাজটা করলো মাত্র। যদিও একই গ্রন্থে আবার কাশীরাজ, কন্যাত্রয় অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ সভায় বলেছিলেন, কন্যা জয় করে বিবাহই শ্রেষ্ঠ বিবাহ। দর্শনকে যেমন আপন প্রজ্ঞা দিয়ে ধর্ম রক্ষা করতে হয়, তেমনি ধর্মকেও দর্শন রক্ষার কাজ করতে হয়। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে না দেখলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে দেখবে কেন? পাণ্ডবগণ হয়তো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি বশ্যতা প্রদর্শন করে থাকবে দ্বিতীয় বার বিবাহ অনুষ্ঠান করে। বিবাহ প্রথার উৎস ছিল প্রেমের আনন্দ, বংশধারা রক্ষা ও জনসংখ্যা বর্ধনের মাধ্যম। তাকেই করা হলো অধিকার রক্ষার হাতিয়ার। বিয়ে মানেই ব্রাহ্মণের অর্থ উপার্জন এবং

সমাজ বিভক্ত রাখার উপায়। এই বিভাগ থেকেই এলো স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বন্ধন। অনতিক্রম্য সেই বন্ধন।

মহাভারতে চার রকম বিবাহ প্রথা অনুমোদিত। মনুর সময় এই প্রথা আট রকম হয়। মনুর বিধানে বিবাহ সংকীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়লো। মন্ত্র পড়ে, যজ্ঞকরে, সপ্তপদী গমন করলেই বিবাহ বৈধ হবে না। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে করতে হবে নিজ জাতের মধ্যে। এই জাত সমগ্র হিন্দু জাতি নয়। জাতি অর্থে স্ববর্ণ। জাতি বা বর্ণ আবার উপজাতি এবং তার উপজাতিতে বিভক্ত। সপিণ্ড বিবাহ নিষিদ্ধ হলো। গোত্র বিচারের নির্দেশ দেওয়া হলো। এর সঙ্গে আবার আছে কৌলীন্য প্রথা। অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক। বঙ্গে এরা রাঢ়ী, বরেন্দ্র, বৈদিক ও শাকদ্বীপী শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈদিকগণ আবার পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই উপবিভাগে বিভক্ত। সকলেই বিবাহ করবে নিজ সমাজে। কুলীনদের জন্য আবার দেখতে হবে মেল এবং পট্টি। এটা হয়ে গেলে শুরু হবে জ্যোতিষমতে যোটক বিচার। যোটক বিচার আট কুট নির্ভর। প্রত্যেককুটের একটি সংখ্যা মান আছে। তার সমাহার হলো ছত্রিশ এই সংখ্যাটি। এই ছত্রিশটি 'গুণ' বলে উল্লেখ করা হয়। পাত্রীকে শুভ বিবাহের জন্য অর্ধেক সংখ্যক 'কুট' বা গুণ পেতে হবে। এসব কিছু ঠিক করে দেবেন পুরোহিত। এরপরও ঘরে ঘরে অস্থায়ী দম্পতির ছড়াছড়ি! অবশেষে হিন্দু বিবাহ। হিন্দু ধর্ম বিবাহকে স্থায়ী এবং চিরদিনের জন্য বলে বিবেচনা করে। কোন কোন ধর্ম বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের অনুমতি দিলেও ধর্মীয় আচার থেকে বিবাহকে পৃথক করেনি। নিজ সম্প্রদায়ে যেখানে এত বাধা, পর সম্প্রদায়ে বিবাহ সেখানে অসম্ভব। কোন ধর্মই অপর কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করে না। এত সব দেখা হলো। কিন্তু বিবাহের যে প্রধান উদ্দেশ্য যৌন মিলন তার যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্নই কেউ করে না।

সন্দেহ নেই যে; বিবাহ হচ্ছে মিলনের একটা সুচিন্তিত, স্থায়ী এবং নিশ্চিত মাধ্যম। এটা পরিবার গঠনের অন্যতম উপায়। এটা রক্তের বন্ধন এবং তা অমিশ্রিত রক্ষায় কার্যকরী বলেও বিবেচিত হয়। সঞ্চয় যে সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য তা হস্তান্তরের জন্য উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হয়। বিবাহ সেকাজেও সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। সমাজের উপর ধর্মের নিরঙ্কুশ আধিপত্য রক্ষার প্রয়োজনেই বিবাহের বৈধতা এবং পবিত্রতা রক্ষার এই প্রচেষ্টা। সকল ধর্ম সংঘই তার বিবাহ বিধি মানতে সকলকে বাধ্য করে। এটা না মানলে সমাজচ্যুতির অস্ত্র প্রয়োগ করে সকল সংঘ-সদস্যকে ঘিরে রাখা হয়। ধর্মের প্রতি সহজাত আনুগত্য তো আছেই। বিবাহ বিধির মাধ্যমে ধর্ম সকল মানুষের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করলো।

মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য ; তাকে সমাজ পতিদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, ধর্ম যতরকম পদ্ধতি আবিস্কার করেছে যৌন-জীবন তথা বিবাহের বিধিনিষেধ তার মধ্যে সার্থকতম হাতিয়ার। এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য ধর্মীয় বিচার (কোষ্ঠী বিচার) এবং আচার (কোথাও বিবাহে ডিম দর্শন অশুভ, কোথাও নববধূ ডিম ভেঙ্গে শ্বশুর বাড়ি প্রবেশ করে) দুটোই সৃষ্টি করা হলো। ঐ আচার-বিচারের সামান্যতম ব্যতয় হলেই জীবন অশুভ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এমন বিশ্বাস লোকমনে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হলো।

বিশ্বাসের ব্যক্তিগত দিকটা এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। সামাজিক বৈষম্যই বিচার্য। উদ্ভবের দিক থেকে অভিন্ন কোন জনগোষ্ঠী পরবর্তী-কালে ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য কেন পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের অধিকার হারাবে এর সন্তোষজনক কোন জবাব নেই। আবার তথাকথিত বর্ণ ভেদের জন্য সমধর্মের জনগোষ্টীতেও বিবাহ নিষিদ্ধ হবে কেন? আনা হলো গোত্র বা টোটেম বিশ্বাস। এভাবে বিবাহ নিষিদ্ধকরণ সমাজ বিবর্তনের প্রথম পর্যায় ছিল না। এই বিভেদ বিদ্বেষের উৎসরূপে কাজ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়। বিবাহ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক

মিলনের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক বিভেদরেখা স্থায়ী করছে। বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হচ্ছে।

যে যুগে বিবাহে কিংবা যৌন মিলনে নিষেধ ছিল না তখনও মানুষ এগিয়ে চলেছে। এই বিভেদ মুক্ত জীবন ও সর্বাত্মক মিলন ধর্ম অস্বীকার করলো কিন্তু পরিবর্তে মানুষকে কী দিল? বিবাহ প্রথায় ধর্মীয় নিষেধাত্মক নির্দেশ প্রতিটি মানুষের মনে, প্রতিটি গৃহে তুলেছে বিভেদের প্রাচীর। এই প্রাচীর নিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সাম্প্রাদায়িক সংস্কার। যা বিবাহ প্রথায় ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রয়োগের আগে ছিল না। বিবাহের সময় প্রতিটি মানুষকে আজ মনে করতে হয় সে কোন সমাজের, কোন ধর্মের এবং কোন শ্রেণীর মানুষ। বিবাহ গড়ে তোলে পরিবার। বংশ ধারায় এই পারিবারিক চেতনা প্রবহমান। সেই চেতনা নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক চেতনা। যা প্রতি প্রজন্মে তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অতি যত্নে সঞ্চারিত করছে।

বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। কেননা, বিবাহের অনুষঙ্গে আছে আনন্দ, মিলন এবং পবিত্রতা। বিবাহের সময় কেউ ভাবতেই পারে না কত বড় সাম্প্রদায়িকতা সে বহন করছে পরবর্ত্তী প্রজন্মে দিয়ে যাওয়ার অলিখিত অঙ্গীকার করে। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে জনমনে যে চেতনা আছে বিবাহ প্রসঙ্গে তা নেই। অথচ অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতা কখনোই সকল মানুষকে স্পর্শ করে না। কিন্তু বিবাহের মাধ্যমে যে সম্প্রদায় চেতনা আসে তা দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে প্রবাহিত। এ যত বড় সমস্যাই হোক, মনে রাখতে হবে, কোন সমস্যাই প্রতিকারহীন নয়। বিবাহের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত হয়, তাও প্রতিকার যোগ্য। এটা না করতে পারলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা কিছুতেই বিদূরিত হবে না। ধর্মীয় সাম্প্রাদায়িকতার তিনটি অস্ত্রের মধ্যে বিবাহ প্রধান।

বিবাহকেন্দ্রী ধর্মাচার দুভাবে তার প্রভাব বজায় রাখে। প্রথমটি

তার নঙর্থক দিক। কেবলই নিষেধাজ্ঞা। পরধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করা চলবে না। উভয় সম্প্রদায় খ্রীষ্টান হলেও ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। নিজধর্মের মধ্যে বর্ণ বিভাগ করে বিবাহ নিষেধ করা হয়েছে হিন্দু ধর্মে। অন্যটি বিবাহিত জীবনে পালন করার জন্য কিছু কিছু নির্দেশ। এই সব নির্দেশ পালনে দৃশ্যত কোন মঙ্গল নেই ব্যক্তি কিংবা সমাজের। যেমন স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী বিবাহ করতে পারবে না। সতী প্রথা আর একটি হৃদয়হীন সামাজিক আচরণ। ১৮২৯-এর ২৭ নং আইনে, রামমোহনের প্রচেষ্টায়, এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু সতী প্রথা তাতে একেবারে বন্ধ হয়নি। কেননা, এই আইন প্রণয়নের ১৫৮ বছর পর ১৯৮৭ সালে আবার সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করতে হয়েছে ভারত সরকারকে। এই আইন প্রণয়ন প্রমান করে সতীদাহ প্রথা চলছে।

কৌমার্য যদি বিবাহের পূর্বে অপরিহার্য গুণ বলে বিবেচিত হয়, তবে তা তো নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই হবে। ধর্মাচার পুরুষের ক্ষেত্রে এটা মানে না। এর ফলে বিধবায় ভরে গেছে হিন্দু সমাজ। এই ব্যবস্থা নীতি প্রয়োগের নামে নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ২৬ নং আইন বিধিবদ্ধ হয়। এতে বিধবাগণ বিবাহের অধিকার পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু কজন বিধবা বিবাহের সুযোগ পেয়েছেন? এখনও বিপত্নীকগণ বিবাহের জন্য কুমারী মেয়ে চান। প্রাক বিবাহ সমস্যা হলো অসবর্ণ এবং সকল ধর্মের মধ্যেই বিবাহ প্রচলনের সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধান বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা দেখা যায় ১৮৭২ সালের ৩নং আইনে। এই আইনের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, এই আইনে বিবাহেচ্ছু নর-নারীকে ঘোষণা করতে হত তারা হিন্দু নয়। এই অসঙ্গতি দূর করা হয় ১৯২৩-এর ৩০ নং আইন প্রণয়ন করে। এর পর আর কাউকে অহিন্দু ঘোষণা করে অসবর্ণ বিবাহ করতে হয় না। এর ফলে হিন্দুদের স্বজাতি ভিত্তিক বিবাহের কড়াকরি অনেকটা

শিথিল হয়েছে। তবুও জনমন থেকে বর্ণ চেতনা এখনো বিদূরিত হয়নি।

বিবাহের ক্ষেত্রে বয়সের প্রশ্নটি হিন্দু স্মৃতিকারদের দারুণ ভাবিয়েছে। তবে তা মহিলাদের প্রসঙ্গেই। পণ্ডিতগণ বিবাহের জন্য মেয়েদের পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম স্থানে আছে নগ্নিকা। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, যে বয়স পর্যন্ত মেয়েরা বস্ত্র ব্যবহার করে না এই বিভাগে আছে সেই বয়সের মেয়েরা। গৌরীদান বলে যে কথাটি প্রচলিত সেই গৌরীরও বয়স হবে মাত্র আট বছর। ন বছর হলেই মেয়েকে বলা হতো রোহিনী আর দশ বছর হলে মেয়েকে 'কন্যা' বলা হতো। এই পর্যায়ের যে কোন একটিতে বিবাহ দেওয়াই ছিল বিধেয়। এই শিশুরা বিবাহের পর তাদের শ্বশুর বাড়ি থাকতে চাইত না। শ্বশুর ঘর করতে যেত একটু বয়স হলে। তার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল মৌনা, দ্বিরাগমন এবং গর্ভাদান প্রথা। দশ বছরের বেশী বয়সের মেয়েকে বলা হতো রজঃস্বলা। এই যে শিশু কিংবা বালিকা বিবাহ তার ফলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতো অনেকে স্বামীদের অবিবেচনায়। ১৯৪৬-এর ১৯ নং আইনে বিবাহের বয়স যথাক্রমে মহিলা ও পুরুষদের জন্য করা হলো ১৪ ও ১৮ বছর। হিন্দু বিবাহ আমৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ। এই মিথ্যা বিশ্বাস ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য হলো ১৯ নং আইন ১৯৪৬-এ। এই আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগের অধিকার দেওয়া হলো; ১৯৪৬-এর ২১ নং আইনে একই গোত্রে বিবাহ আইনসিদ্ধ হলো। ১৯৪৯-এর ২১ নং আইনে হিন্দুর বিবাহে জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর বাঁধাও তুলে দেওয়া হলো। ১৯৫৫-এর হিন্দু বিবাহ আইন বিবাহকে ধর্মাচার থেকে একেবারে মুক্ত করে দেওয়া হলো।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচার এবং অন্যান্য ধর্মাচারও একটু একটু করে বিবাহকে সাম্প্রদায়িক বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল। সর্বত্রই চলছে এর প্রতিকারের প্রচেষ্টা। কিন্তু ধর্মাচার আড়াই তিন হাজার বছর ধরে যে মানসিকতা গড়ে তুলেছে, বুদ্ধি দিয়ে তা অস্বীকার করলেও বহু মানুষই হৃদয় দিয়ে

তা পালন করেন। সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী কলামের ভাষা দেখলেই এটা বোঝা যাবে। বিবাহে ধর্মাচার মুক্ত হওয়া এখনো অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক যে চিন্তা-চেতনা বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে তা তো ভাঙ্গতেই হবে। তাই বিদ্যাসাগরের মতই প্রবঞ্চিত হলেও, বিধবা বিবাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকা চলবে না। অনেকেই বর্ণ, গোত্র, জাতি মান্য করবেন জেনেও এর বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে হবে। আইনগুলো সেকারণেই রচিত। বিবাহ-বিভেদ না ভাঙ্গতে পারলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকবেই। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের উৎস মুখ। বাইরে থেকে চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার সুচিন্তিত পথ নয়।

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মসংঘ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দের মাধ্যমে মানুষ তার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। বাক্যে শব্দের স্থান এই অভিপ্রায়কে সুচিহ্নিত করে। এ কারণেই, লেখক যখন তার লেখার কোন শব্দ কিংবা শব্দবিন্যাস পাল্টে দেন, তখন পাঠককে তা গভীরভাবে ভাবায়। স্বামী বিবেকানন্দের লেখায়ও এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমি একটি বিশেষ শব্দ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি অসমাপ্ত পুস্তকের প্রস্তাবিত নাম :— "জগতের কাছে ভারতের বাণী"। প্রস্তাবিত এই সন্দর্ভের জন্য তিনি বারোটি সূত্রের একটি খসড়া রচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকাটি তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবিত গ্রন্থটি শেষ করতে পারেন নি। দার্শনিক কাল মার্কসও একটি অসমাপ্ত গ্রন্থের এগারোটি সূত্র রচনা করেছিলেন। ভুবনজোড়া খ্যাতির অধিকারী সেই সূত্র সমষ্টি 'থিসিস অন ফয়ের বাক্" নামে প্রসিদ্ধ।

স্বামীজীর প্রস্তাবিত গ্রন্থের প্রথম সূত্রটিতে তিনি বলেছেন, 'পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বীরত্বপূর্ণ। দেশবাসীর উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর"। পরিকল্পিত পুস্তকের ভূমিকাতেও তিনি প্রথমেই লিখেছেন, 'প্রতীচ্যের জনগণের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত'। লক্ষণীয়, স্বামীজী বীরত্বপূর্ণ শব্দটির পরিবর্তে তেজোদীপ্ত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি বীরত্বপূর্ণ শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করলেও তার অর্থ ব্যঞ্জনায় পরিতৃপ্তি লাভ করেন নি। ভূমিকায় তাই শব্দটি পরিবর্তন করেন। বীরত্ব শব্দের ভাব-রূপে আছে বলের প্রাধান্য। যেটা শরীর নির্ভর। কিন্তু তেজ বা দীপ্ত শব্দে আছে জ্যোতি কিংবা আভার ব্যঞ্জনা। আলোয় আছে প্রভা। যা দ্যুতিময়। এর সঙ্গে যোগ মনের। শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তির দিকেই এই শব্দের টান। মনের প্রাধান্য সূচিত করে এই শব্দটি। অন্য একটি ব্যঞ্জনাও কষ্টকল্পিত নয়। আলো নিজেকে

নিঃশেষ করেই বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আত্মদানের এই উদাহরণটি হয়তো স্বামীজীর মনে এসেছিল।

স্বজাতিকে স্বামীজী উপহার দিয়েছিলেন বলিষ্ঠতর শব্দটি। এই শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে 'ভূমিকা' এবং 'সূত্রে' অভিন্ন। একটি প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দেখি এই শব্দটির মাধ্যমে। ভারতবাসীকে তিনি যা কিছু দিতে চান তা তিনি স্থির করে রেখেছেন। কিন্তু বিশ্ববাসীকে যা দিতে চান হয়তো তার রূপরেখা এখনো স্পষ্ট নয়। এও হতে পারে, তিনি যতই বিদেশে পরিভ্রমণ করছেন ততই যেন স্পষ্ট হচ্ছে তাদের কী দিতে হবে। এই শব্দযুগল স্বামীজীর কর্মের লক্ষ্য ও স্বরূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে। তিনি বিভিন্ন ভাবে একথা আমাদের বলেছেন যে, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" পেট যাদের ভরা, ধর্মের কথা তিনি তাদের শোনাতে চান। শক্তি তাদের আছে, অভাব ভাবের। আধ্যাত্মিক চেতনা এই ভাব সঞ্চারের কাজটা করতে পারে। এইভাবে বলিষ্ঠ মানুষের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে নব-ভাবের সঞ্চার করে, তিনি জগতের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি সম্ভব করে তুলতে চান।

ধর্মের জন্য, স্বামীজী মনে করতেন, চাই সমর্থ মনুষ্য সম্প্রদায়। এই সমর্থ মানুষের মুখোমুখি হন তিনি প্রতীচ্যে। এ কারণে তাদের মধ্যে ধর্মভাব জাগাতে চেয়েছিলেন।

'ধর্ম' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। বহু ব্যবহারে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। যা ধারণ করে তাই 'ধর্ম' বললে ধর্মের অর্থ অতিব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু যদি বলা যায়, নিজ নিজ কাজ ভালোভাবে করাই ধর্ম, তবে ধর্ম শব্দের অর্থ বৃত্তি নির্ভর হয়। স্বামীজী এসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি তাই ধর্ম শব্দটিকে প্রথমেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। স্বামীজীর মতে ধর্ম ও মোক্ষ সমার্থক নয়। মোক্ষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত হলো—"মোক্ষ কি? যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।…অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরের বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব

হলে চলবে না।” এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্ম ও মোক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ‘এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম ও কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হলো, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হলো।…যদি দেশ শুদ্ধ লোক মোক্ষ ধর্মই অনুশীলন করে, সে ত ভালোই, কিন্তু তা হয় না। ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। হিন্দু শাস্ত্র বলছে যে, ধর্মের চেয়ে মোক্ষ বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি চাই।”

স্বামীজী ধর্ম অনুশীলন করতে বলেছেন আম জনতাকে কিন্তু মোক্ষ নয়। এও তিনি বলেছেন, মোক্ষ ধর্মের পরের ধাপ। তাই ধর্ম অবশ্য পালনীয়। কিন্তু মোক্ষ না হলেও চলবে। ওটি তিনি অল্প সংখ্যকের আচরণীয় বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই। তুমি তোমার ধর্ম কর।”

আম জনতা যে ধর্ম পালন করবে বিবেকানন্দ তারও রূপরেখা স্থির করেছিলেন। তিনি ধার্মিকের লক্ষণ বলতে বুঝেছেন সদাকার্যশীলতা। হয়তো এ কারণেই বেদের যে সকল স্থানে কাজ করার নির্দেশ নেই, সেই অংশগুলিকে তিনি অনুসরণ করতে বলেন নি। এই কার্য হলো সমাজগত মানুষের করণীয় কর্ম। একারণেই হত্যা করতে উদ্যত ব্রাহ্মণ বধ করলে, ঐ কাজকে তিনি পাপ বলেন নি। এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই মনুপন্থী। বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা। তিনি কর্মীকেই বীর বলতেন। তিনিই ভোগের অধিকারী যিনি বীর্যবান। সাম-দান-ভেদ দণ্ড নীতি প্রকাশ করে প্রকৃত ধার্মিক হতে বলছেন বিবেকানন্দ। অপমান হজম করে চুপটি করে থেকে যাপন করা জীবনকে তিনি বলেছেন ঘৃণিত।

মনে হতে পারে কর্মকেই তিনি ধর্ম বলেছেন। তা যদি হয় তো বস্তুবাদী ধারণার মাপকাঠিতে তাঁকে প্রয়োগবাদী বলা যায়। কিন্তু

এটা হবে অতি সরলীকরণ—বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে। কর্মের গুরুত্ব স্বীকার করেও বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক এবং অধ্যাত্মবাদী। Realism কে বিবেকানন্দ বলেছেন বাস্তববাদ। তিনি নিজেও ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি সম্ভবতঃ ভারতীয়দের অপর্যাপ্ত ধর্মের আত্মহননকারী পথ থেকে তাদের কর্মের পথে আনতে চাইছিলেন। প্রচলিত অর্থে তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেন নি। তথাপি তিনি ধর্ম পথেরই যাত্রী। কেননা, তিনি মনে করেন, এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন···"জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাহার কাজ"। [পৃঃ-১০৭ / খ/১ম।] "ধর্ম বিজ্ঞান" প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, ধর্ম চিন্তা মানবের প্রকৃতি গত, উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজে দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করিতে পারে ততদিন তাহার পক্ষে ধর্মত্যাগ করা অসম্ভব" (পৃঃ-৭ / ২য় খণ্ড)

মোক্ষ এবং ধর্মের বিভাজনের পর এই মন্তব্য আমাদের দ্বিধান্বিত করে। বিবেকানন্দ ধর্ম বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন? এভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, ধর্মকে তিনি কর্মের সমার্থক এবং পরাশক্তির প্রতীক এই উভয় দিক থেকেই দেখেছেন। ভারতবর্ষের জন্য ধর্মকে তিনি কর্মের সমার্থক মনে করেছেন এবং ঐভাবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রতীচ্যের জন্য তিনি ধর্ম অর্থে মোক্ষই বুঝেছেন। সম্ভবতঃ একারণেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজ নিয়ে গভীর ভাবে অনুশীলন করেছেন। এর পরিচয় পাই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পুস্তকে।

বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা মূলক বিশ্লেষণ করেছেন "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামের পুস্তকে। তিনি উভয় সমাজের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য সমাজে জড়ের প্রভাব অধিক কিন্তু প্রাচ্য সমাজে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন মাত্রাতিরিক্ত। তিনি সামঞ্জস্যের জন্য উপায় খুঁজছিলেন। তিনি রাজযোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে একটা পথ পেলেন।

"রাজযোগ জিজ্ঞাসা করেনা, তোমার ধর্ম কি? তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, ইহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা মানুষ ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে। অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।" [পৃ-২১৮ / খ১ম।]

বিবেকানন্দ প্রত্যেককে সমান মর্যাদাবান মানুষ বলে স্বীকার করে নিলেন। সেই সঙ্গে আপন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বৃত্তের বাইরেও এলেন। রাজযোগ জিজ্ঞাসা করে না তোমার ধর্ম কি। অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করলেন। প্রত্যেক মানুষ নিজেই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করার অধিকারী এবং যোগ্য ; একথা বলে তিনি গুরুবাদ ভেঙ্গে দিলেন। তিনি পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করলেন। ব্যক্তির হাতে কারণ জিজ্ঞাস করার অধিকার দেওয়ার অর্থ হলো, প্রচলিত বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্ম সম্প্রদায়ের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা। মানুষকে তার যথা স্থানে স্থাপন করলে ঈশ্বরের আসন টলে যায়। সঙ্গীত চিত্র কিংবা কবিতা সৃষ্টিকারী মানুষ নিজেই স্রষ্টা। সাড়ে তিন হাত মানুষ যখন তাজমহল কিংবা পিরামিড গড়ে তোলে তখন তার ঈশ্বরের প্রয়োজন কোথায়? সে যে আপনাতে আপনি পূর্ণ। মানব প্রেমের টানে বিবেকানন্দও এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি তার যে সমাধান সূত্র দিয়েছেন তাই একালের সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে মানবতার উৎসরূপে বিবেচিত হতে পারে।

মানুষকে বহু মনীষী শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তাতে যুক্তি কতটা কাজ করছে বলা কঠিন কিন্তু আবেগ যে তাদের তাড়িত করেছে এতে সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ছিলেন উচ্ছ্বাসহীন। চেতন জগতে মানবই শ্রেষ্ঠ জীব। কেননা, "বিশ্বজগতে এই মানব দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠজীব। মানুষ সর্বপ্রকার

জীবজন্তু হইতে এমন কি দেবাদিদেব হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। দেবতাদিগকে আবার নামিয়া আসিতে হয় এবং দেহের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞান লাভের অধিকারী। দেবতারাও এবিষয়ে বঞ্চিত।"

[পৃঃ ২৩১/খ-১ম]

মানুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলেও মানব সমাজের সামাজিক অসাম্য উপেক্ষা করা যাবেনা। শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে অল্পকয়েকজন হাজার হাজার মানুষকে শোষন করে কোন যুক্তিতে? দেবতার কোন মহিমা এতে প্রকাশ পায়? শ্রেণী বিভাগ কিংবা শোষক-শোষিতের উল্লেখে যাদের যারপর নাই অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠে তারাও বিব্রত বোধ করেন সীমাহীন বুভুক্ষার মিছিল দেখে। কেন অনেক মানুষ এত দীন জীবন যাপন করেন? কী তাদের অপরাধ? মানব সমাজের দৈন্য বিমোচনের পরিবর্তে দেখা যায় ধর্ম প্রচারের জন্য সীমাহীন সম্পদের ছড়াছড়ি। এই প্রসঙ্গটি স্বামীজীকে উদ্বেগাকুল করেছে। বলেছেন, "তোমরা ভারতে সর্বত্র গির্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব —ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নর-নারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনান বা দর্শন শাস্ত্র শোনানো তাহাকে অপমান করা।"

[পৃঃ ২৯ / খ-১ম]

তবুও ধর্মের কথা মানুষ শোনে এবং তাকে শোনানো হয়। প্রাণ-আকাশ-আত্মা এই ত্রিমাত্রিকতা নিয়ে বিবেকানন্দের যে ধর্ম তত্ত্ব সে প্রসঙ্গ উহ্য রাখছি। পূজা-অর্চনা, বিচারহীন আচার কেন প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। কেন তা হয়ে উঠে অবশ্য মান্য? পাশ্চাত্যের জিজ্ঞাসুকে বিবেকানন্দ হয়তো বলতেন, তোমরা মুখে বলো সোল (আত্মা) কিন্তু তার মানে জানো না। আত্মাকে জানো বোঝ। উপলব্ধি করো কাকে বলে তত্ত্বমসি আর কেন বলা হয় সোহম। তাহলেই আচার-অনুষ্ঠান

মনে হবে অর্থহীন। কিন্তু এ জিনিস তো ভারতীয়দের প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক অনুধাবন করলেন। তিনি দেখলেন, প্রশ্ন নয়, মুক্তির চিন্তা নয়, জীবের বিকাশ নয়, প্রচলিত ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেই রয়ে গেছে তার আনুগত্য। আনুগত্য প্রকাশের স্থানতো এটা হতে পারে না। কেননা, "পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়—ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি মাত্র। এই জন্যেই দেখিতেছি সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত···বক্তা আমাকে তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই, উহা বিশ্বাস করিতে বলেন। যদি তাহারা কোন যুক্তিচান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে পারিনা। এই জন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখা যায়।"

[পৃঃ ২.২ / খ-১]

মানুষের বিকল্প শব্দ হলো যুক্তিবাদী প্রাণী। সেই মানুষ যুক্তিবোধ পরিহার করে আনুগত্য প্রদর্শনকেই ধর্ম পালন করা বলে মনে করলো কেন? তাদের ওভাবেই চালিত করতে চেয়েছিল পুরোহিতগণের পূর্বপুরুষ ঐন্দ্রজালিকেরা। ঐন্দ্রজালিকেরা অনুধাবন করে করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলো যে, মোটামুটি কতটা সময়ের ব্যবধানে জোয়ার ভাঁটা হবে। তারা জানত না যে, নদী কিংবা সমুদ্রে যে জলস্ফীতি হয় তার কারণ চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ জনিত জলস্ফীতি। কারণ না জানার ফলে তারা কারণ জানার আগ্রহ সৃষ্টিতে কিছুমাত্র উৎসাহ দিত না। এরা এটা দৈব শক্তির ইচ্ছা বা কারণ বলে প্রচার করে প্রাকৃতিক ঘটনার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দানের সম্ভাবনাই বন্ধ করে দিল। পরিবর্তে প্রচার করা হলো, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের তত্ত্ব। ঐন্দ্রজালিক কিংবা পুরোহিতদের কৃতিত্ব এটাই যে, তারা তাদের ইচ্ছাকে জনতা-গ্রাহ্য করে নিতে পেরেছিলো। ক্রম বিবর্তিত হতে হতে

এখন ধর্ম এবং বিশ্বাস সমার্থক হয়ে উঠেছে। এর ফলে বহু বিজ্ঞানীও ধর্মের প্রশ্নে যুক্তি প্রয়োগ করে না। বিভাগটা এই রকম : বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো যুক্তি এবং প্রয়োগ ; অপর পক্ষে ঈশ্বরের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের উপর।

স্বামীজীর সঙ্গে ধর্মপণ্ডিতদের বৈপরীত্য এইখানে। যুক্তি এবং বিশ্বাসের সংঘাত থেকে। পুরোহিতরা যেভাবে ধর্মকে দেখতে চাইলেন, তাদের যেভাবে দেখার প্রয়োজন ছিল, স্বামীজীর আদৌ তা ছিল না। ধর্ম প্রচার যাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস, তারা ধর্ম বিচার, ধর্মাচার, তার প্রথা-পদ্ধতি নিজেদের হাতে রাখাই নিরাপদ মনে করবেন। যুক্তির দ্বারা এই আচারের ব্যাখ্যা করে তাকে দুর্বল হতে দিলে পুরোহিত সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষের মুক্তি। মানুষকে তিনি ঈশ্বরের উপরে স্থান দিয়েছেন। তথাপি তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী। বৈদান্তিক, জ্ঞানযোগী, এবং যুক্তিবাদী। মানবমুক্তি বিশ্বাস নির্ভর নয়, কর্ম নির্ভর। কর্ম যুক্তি নির্ভর। স্বামীজীর ঈশ্বরও যুক্তির দ্বারা লভ্য। প্রচলিত আচার মেনে ঈশ্বর অন্বেষণ—বৃথাই তাকে খোঁজা। "এই ভাবে দেবতাকে বৃথা অন্বেষণ করিবার পর মানুষের পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। যেস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই সে ফিরিয়া আসে—সেই মানবাত্মায় : তখন সে বুঝিতে পারে যে, যাহাকে সে এতকাল ধরিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্য শাসনকারী বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছে, সেই ঈশ্বর সে নিজেই। আমিই তিনি এবং তিনিই আমি। আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর ছিলইনা এবং এই ক্ষুদ্র আমির অস্তিত্বও কোন দিন ছিলনা।"

[পৃ-৩০৭ খণ্ড-২য়।]

স্বামীজীর লেখায় আমরা বির্বতনবাদের উল্লেখ লক্ষ্য করেছি। তিনি বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি মানতেন এবং তা গ্রহণও করেছিলেন। মানুষ থেমে থাকবে না। তার একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য মানুষের মধ্যে আছে গতি। এই গতিকে

কাজে লাগিয়েই মানুষ 'মানুষ' হয়েছে। "গোরু কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট; আর ঐভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানুষ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগতাতীত সত্তার অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানব-জাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

[পৃঃ-৯ / খ-২য়]

জগতাতীত শব্দটি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে। স্মরণ রাখলেই চলবে যে স্বামীজী বিশ্বের তাবৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রশ্ন তিনি করতেন এবং উত্তরও দিতেন। জগতাতীত শব্দনিয়ে দ্বিধা অর্থহীন। কেননা তিনি বিশ্বের রূপরেখা অবগত ছিলেন। বিবেকানন্দ যাদের জড়বাদী বলেছেন, তারা বলেন, জ্ঞানের সন্ধান হলো জানা থেকে অজানায় মানুষের নিয়ত হেঁটে চলা। মানব জীবন ও সংস্কৃতি হলো এক বহমান কর্ম স্রোত। ভাববাদ (বিবেকানন্দ বলেছেন Idealism বা বিজ্ঞানবাদ) এবং বস্তুবাদের (বিবেকানন্দ বলেছেন, Realism বা জড়বাদ) বিরোধ সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

দার্শনিক তত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে স্বামীজীর স্বচ্ছ দৃষ্টি আমাদের প্রয়োগবাদী হতে উৎসাহ দেয়। কেননা, "রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক উপাদান হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে যখন তাহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাহারা কখনো উপস্থিত হন, তখন তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না, তখন রসায়ন বিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে। ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি আমরা একরূপ আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহার পর আর কোন উন্নতি হইতে পারে না।" [পৃঃ ১১-১২ / খ-২য়]

স্বামীজী কার্য-কারণ সম্পর্কও মানেন। "ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন" বলে, প্রকৃতির উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গটি তিনি শেষ করে দিতে পারেন না। এই পর্যায় বস্তুবাদীদের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তার মিল বিস্ময়কর। বস্তুবাদের প্রতিষেধের প্রতিষেধ স্বামীজীর কাছে এই ভাবে এসেছে—"এই পূর্ববর্তিতা ও পরবর্তিতাকেই নিমিত্ত বা কার্য-কারণ ভাব বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি বা অনুভব করি— সংক্ষেপে জগতের সব কিছুই একবার কারণ, আবার কার্যরূপে অনুভূত হইতেছে। একটি জিনিস তার পরবর্তীটির কারণ, উহাই আবার তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্য।"

[পৃঃ ২১২ / খণ্ড-১ম]

ধর্মীয় জীবনকেও তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিকের মধ্যে তিনটি শক্তি কার্য করে। প্রথমে দেখা যায় সর্বনিম্ন শক্তি। এটিকে তিনি বলেছেন আকর্ষণ স্বরূপ। আর একটি মধ্যম শক্তি আছে। তিনি যার নাম দিয়েছেন, কিঞ্চিৎ উচ্চতরশক্তি। এটির স্বভাব বিকর্ষণ স্বরূপ। তৃতীয় শক্তিকে তিনি বলেছেন সর্বোচ্চ শক্তি। এটি উভয়ের সংযম।

বিবেকানন্দ ধর্মবোধের জাগরণ এবং প্রয়োগের মাধ্যমেই জীবনের পরিণতি লাভ করা যায় বলে মনে করতেন। তাঁর ধর্ম চিন্তাও ত্রিস্তর সমন্বিত। সংযম একেবারে শেষ পর্যায়ে পাওয়া যায়। এই অবস্থা বিশিষ্ট মানুষই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত ধর্মাচারের সঙ্গে এই আদর্শের মিল নেই আদৌ। প্রচলিত ধর্মসংঘগুলির প্রধান ত্রুটি হলো তা সমন্বয়ের পরিবর্তে বিরোধ সৃষ্টি করে। কেননা, "প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া সেগুলিকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে।...যে ঐ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে গতি ভয়াবহ হইবে।" [পৃ-১৫১-৫২ / খ ৩য়]। যদি পরলোকে শাস্তি পাওয়ার দ্বিধাহীন বিশ্বাসে প্রচলিত ধর্ম সংঘসকল আস্থা রাখতে পারত, যা তাদের পারাই উচিত, কেননা, সকল ধর্মেই শেষ বিচারের কথা বলা

হয়েছে, তাহলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনেক কম হত। শেষ বিচারের মালিক বলা হয় ঈশ্বরকে। আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার ক্ষমতায় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ তার অনুগামীরাও সামান্যতম আস্থাও রাখতে পারেন না। ঈশ্বরের নামে এবং ঈশ্বরের জন্য, বিচারের ন্যায়দণ্ড এরা তুলে নেন নিজেদের হাতে। তার ফলাফল স্বামীজী নিজেই বর্ণনা করেছেন।

"ধর্ম প্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্ত বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ের অপর কোন ঘটনায় তাহা ঘটে নাই, আবার ধর্ম প্রেরণায় যত চিকিৎসালয় বা আতুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অন্য কিছুতেই তত হয় নাই।...ধর্ম প্রভাব মানুষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্ম প্রভাবে মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই ঘটিবে।" [পৃঃ ১৫০ / খণ্ড ৩য়] সাম্প্রতিক ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দ্বারা স্বামীজীর এই উক্তির যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

ধর্মসংঘের মধ্যে কোমল ও কঠিনের সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন বিবেকানন্দ। কিন্তু প্রেম নয় বিদ্বেষ, ভালোবাসা নয় হিংসা, কোমলতা নয় কঠিণ্যই প্রচার করেছেন ধর্মসংঘের সদস্যগণ ধর্ম বলে। আতুরাশ্রম নয় ধ্বংসের স্মৃতিই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহণ করে নিয়ে চলেছে ধর্মের নামে। শত শত বৎসরের প্রাচীন কাহিনী কিংবা কল্পকাহিনী আজও এক ধর্মসংঘের মানুষকে অন্যকোন ধর্মসংঘের মানুষকে হত্যায় প্ররোচিত করে। ভবিষ্যতেও চলবে দু একটি আতুরাশ্রমের পাশে দলবদ্ধ হত্যাকাণ্ড। কেননা, "কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুর্মতি বশতঃ করিয়া থাকে, তাহা নয়—গোঁড়ামি নামক মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাধি বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট। কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলদেরই মতো সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত।

অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মত এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যতরকম প্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ু মণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয়, এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।" [পৃঃ-১৫২/খণ্ড-৩য়]

গোঁড়ারা হিংস্র হয় কেননা তারা যুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাসের দ্বারা মানুষের আনুগত্য চায়। সমকালের কবির মতই এই অগ্রজদের অটল বিশ্বাস স্বীয় মতে। মতবাদ অবশ্যই হওয়া উচিত যুক্তি নির্ভর। মতবাদ বিশ্বাস নির্ভর বলেই পরিণতি এমন ভয়াবহ হয়।

এই যে জিদের পথ, বিশ্বাসের পথ, এবং সংস্কার মান্যতা, এতো মুক্তির পথ নয়। প্রগতি কিংবা বিকাশ—মানব জীবনে এপথে হবে না। বিবেকানন্দ কথিত আত্মার উপলব্ধি কিংবা আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন ঘৃণার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব। এবিষয়টিও স্বামীজীর নজর এড়ায় নি। তিনি তাঁর অন্বিষ্ট মুক্তির পথটি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। "সারা দুনিয়ায় লম্বা চওড়া কথার মাত্রা বড়ই বেশী। আমরা চাই কথা কম এবং যথার্থ কাজ কিছু বেশী হউক।" [পৃঃ ১৫৫ / খণ্ড-৩য়]

বিবেকানন্দ যে যথার্থ প্রয়োগবাদী ছিলেন একথা পূর্বেই বলেছি। কাজ যা হবে তা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। যদিও তিনি এতে কিছু সংশয়ী ছিলেন। কেননা, "ধর্ম রাজ্যের এই প্রবল বিবাদ—বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি সম্ভব?" মানব প্রেম তাঁকে যত টেনেছে তিনি ততই ধর্ম-জগৎ থেকে দূরে সরে গেছেন। ভেবেছেন মুক্তির পথ কোনটা। মোক্ষ নয়। এই সংসারে থেকেই মুক্তি চাই। তিনি এক উন্নত জীবন চর্চার কথাই ভাবলেন। যদিও তিনি সকল প্রাণীর বিকাশ চেয়েছেন। কিন্তু মানুষের মুক্তি চিন্তা যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ছিল। বাধা কোথায়? তিনি দেখলেন, "যে প্রাণী যত নিম্ন স্তরের হইবে, ইন্দ্রিয় সুখে সে তত অধিক সুখ পাইবে" [পৃঃ ১২৭ / খ-৩য়] জন্তুর জন্যই এই প্রস্তাবটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও এই নিয়ম

প্রযোজ্য। যে-সমাজ যত উন্নত সেই সমাজ তত বহির্মুখী। তারা অপরের কথা ভাবে। কিন্তু সভ্যতার স্পর্শ রহিত জনসমাজে প্রকৃতিই প্রধান। নানাভাবে লালিত সংস্কারগুলো তাদের অন্তর্মুখী করে রেখেছে। একারণেই, "প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি-এধারণার সহিত আমি একমত নই"। বস্তুবাদীরাও বলে, প্রকৃতির নিয়মের সূত্র জেনে তাকে ভাঙতে হবে মানব কল্যাণে ব্যবহারের জন্য। এই প্রয়োগের সূত্র আবিষ্কার এবং, ব্যবহার হলো মুক্তি।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রসার এবং টিকে থাকার ইচ্ছা জন্মমুহূর্ত থেকে মানব জীবনে দেখা যায়। "শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শিশুর প্রথম শব্দ স্ফুরণ হইতেছে ক্রন্দন—যে বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। মুক্তির এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই ধারণা জন্মায়, এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত স্বভাব।" [পৃঃ-১০৭ / খ-৩য়] এমন একজন পুরুষের উপস্থিতি নিয়ে দ্বিমত থাকবে কিন্তু সহমত পোষণ করা সম্ভব হবে স্বামীজীর এই কথার সঙ্গে—"জীবন শক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না' ··মুক্তি, অহো মুক্তি! মুক্তি, অহো মুক্তি। আত্মার অন্তস্থল হইতে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। বন্ধন হায়, প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই জীবনে অদৃষ্ট বা পরিণাম বলিয়া মনে হয়। অতি প্রাকৃত শক্তি লাভের জন্য সর্প ও ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্মমত ও সাধন প্রণালী থাকিবে কেন?" [পৃঃ ১০৭ / খণ্ড-৩]

সর্ব প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। সংস্কার বর্জিত হতে হবে। না হলে মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না। তাই, "মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেইখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য। সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালই হইয়াছে, কিন্তু এখন উহা ছাড়িয়া দাও" [পৃঃ ৩৭৩ / খণ্ড ২য়] নিজেকে কোন রকম সাম্প্রদায় অথবা সাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যে আবদ্ধ না-রাখা মুক্তির

প্রথম শর্ত। ব্যক্তির সম্পর্ক নিখিল বিশ্বের সঙ্গে। দায়বদ্ধতা এই বিশ্বের চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে। আমি কেন মাত্র একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে তৃপ্ত হবো। কেন আমাকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? সাম্প্রদায়িক পরিচয় পরিত্যাগ হলো নেতিবাচক চিন্তা। ইতিবাচক চিন্তা চাই। বলতে হবে আমি অসাম্প্রদায়িক। আমার যোগ নিখিল বিশ্বে। সেই যোগে আমার মুক্তি। এটা হলেই অপরের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি এবং অপরের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে মনে হবে। এই ভাবনা অশ্রদ্ধেয় যে, কেবলমাত্র কোন সংঘের সদস্যদের সুখে আমি সুখী এবং দুঃখে দুঃখী। চাই সত্য বোধ। "সত্যকে জানো এবং এক নিমেষেই মুক্ত হইয়া যাও। তখন সব অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে। যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করে তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়। যখন সকল নর-নারী, সকল দেবতা দেবদূত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হইয়া যায়—তখন সমস্ত ভয়ও দূর হইয়া যায়।" [পৃঃ ৩০৭ / খণ্ড-২য়] সাম্প্রদায়িক শক্তি এটা চায় না। কেননা "মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র গালাগালির দ্বারা দাবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা সেখানেই মুষ্টিমেয় গ্রীক কথা বলে।" [পৃঃ ১৭২ / খণ্ড ১ম]

এই গ্রীকরা অসাম্প্রদায়িক। এরা সর্বদাই সংগঠিত সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি সম্পন্ন শক্তির আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠে। ভেদবুদ্ধি প্রবণ শক্তি আপন হস্তে বিচারের ন্যায় দণ্ড তুলে নেয়—অভিযোগ করে, বিচার করে এবং শাস্তি দেয়। যদিও হওয়া উচিত ছিল, "আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি। যেন অপর জাতির আচার ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপ কাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্ব জগতের মাপ কাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবেনা।" (পৃঃ ৮৮ / খণ্ড-১ম)

পাঠক, অপর জাতির স্থলে অপর সম্প্রদায় পাঠ করলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বোঝা আরো সহজ হবে।

নিখিল বিশ্ব হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন। এই কাজটি করা মানে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙ্গা। স্বামীজি এটা চাইছেন। মিলন চাই কিন্তু সকলের বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর। ঐতিহ্য রক্ষা কর। লেনিন বলেছেন, "we are cultural conservative." স্বামাজী বলেন, "অতীতের যাহা কিছু ভালো, তাহার সবই অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে এবং পূর্ব সঞ্চিত ধর্মভাণ্ডারে নূতন ভাব সংযোগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।" (পৃঃ-১২৯ / খণ্ড ৩য়) মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো গ্রহণের ক্ষমতা। কিন্তু অপরের ভালো কিছুও গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রচার করে সাম্প্রদায়িক শক্তি। "বর্তমান সময়েও আমরা দেখিতে পাই বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, কারণ এক সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায় যেভাবে করিতেছে ঠিক সেইভাবে নিজের আদর্শগুলি উপস্থিত করিতে চায় না। এই জন্য ধর্মগুলিকে উদার হইতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্তমানে অনেক ধর্ম যেভাবে অপর ধর্মের প্রতি অনুগ্রহ, কৃপাপূর্ণ ও কৃপণোচিত সদিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা চলিবে না।" [পৃঃ ১২৯-৩০ খণ্ড / ৩য়]

এই ভাবে, বিচার নয় আচার, ধর্মসম্প্রদায় সমূহর মধ্যে স্থায়ী হয়। আবার ধীরে ধীরে তা সংস্কারে পরিণত হয়। দেখা দেয় ভেদবুদ্ধি। ভেদবুদ্ধি থেকে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গার রূপ ধরে। সর্বজীবে যার সমদৃষ্টি তিনি কখনো এই প্রবণতা মেনে নিতে পারেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সহনশীলতা তিনি চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এইভাবে দেখাদেবে সম্প্রীতি এবং গড়ে উঠবে মিলনের বাতাবরণ। সহনশীলতা প্রদর্শনের পথে বাধা কোথায়, কতটা এবং তার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সকল ধর্মের মধ্যেই তিনি তিনটি ভাগ লক্ষ্য করেছেন।

প্রথমভাগে আছে প্রত্যেকধর্মের মূলতত্ত্ব সমূহ। একে তিনি বলেছেন ধর্মের দার্শনিক ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে তিনি স্থান দিয়েছেন প্রত্যেক ধর্মের পৌরাণিক অংশ সমূহ। তিনি তার নাম দিয়াছেন, অপ্রাকৃত বা স্থূল অংশ। স্থূলতর অংশকে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাগ নামে অভিহিত করেছেন। প্রথম অংশের বিশ্লেষণ অন্তে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, "সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই।" [পৃঃ ১৬১/খণ্ড-৩য়] দ্বিতীয় বা পৌরাণিক অংশ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—"বিভিন্ন-ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে? পৌরাণিক দৃষ্টিতে এমন কোন ঐক্য, এমন কোন ঐতিহাসিক সার্বভৌমিকতা আছে কি, যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। পৌরাণিক দিক হইতে এইতো আমাদের মিল। যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, আমাদের ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষেরা এই অত্যাশ্চার্য কাজ করিয়াছিলেন। অপর সকলে বলিবে, ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিবে, তাহাদের নিজেদের ঈশদূতগণ ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য জনক কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবি করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যিনি এই সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন" [পৃঃ-১৬২-১৬৩ / খণ্ড ৩য়]

প্রসঙ্গটি সমকালে সমধিক প্রাসঙ্গিক। ইতিহাস ও পুরাণের প্রভেদ করা খুব জরুরী কাজ। কিন্তু ধর্ম থাকবে অথচ পুরাণ থাকবে না তা কি হয়? তৃতীয়তঃ স্বামীজী স্থূলতর অংশ অর্থাৎ ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। "সম্প্রদায় বিশেষের হয়তো কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে এবং তাহারা উহাকেই পবিত্র এবং অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার

বলিয়া মনে করেন। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, যাহা সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে স্বীকার্য ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তাহা হইলে ধর্মের কোন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়া তোলা কিরূপে সম্ভব হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক—তাহা কি?" [পৃঃ-১৫৩/১৫৪ খণ্ড-৩য়]

এই বিশ্লেষণের পর বিবেকান্দের সুচিন্তিত অভিমত হলো, "প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি মানুষকে দুর্বল করিতেছে"। প্রসঙ্গতঃ আমরা কালমার্কসের অভিমত উল্লেখ করতে পারি। তিনি ধর্মকে বলহীনের আফিং বলে অভিমত দিয়েছেন। "সুতরাং সেগুলি কি ভুল নয়? ঐগুলি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর" [পৃঃ-১৯২ / খণ্ড ২য়]

ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থে কুসংস্কার। কুসংস্কারের বিষময় ফল প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্বামীজী তাঁর বক্তব্যের উৎসে আবার ফিরে এলেন। সহনশীলতা তাঁর একটি অতি প্রিয় প্রসঙ্গ। "কাহারো বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। জানিও—ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শ স্বরূপ হইয়াই ধর্ম, অনুভূতিই ধর্ম।" [পৃঃ-১৭৩/খণ্ড-১ম] অনুভূতি অপরের নির্দেশে আসতে পারে না। এটা ব্যক্তির মধ্যে তখনি প্রকাশিত হবে যখন সে নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখবে। অসাম্প্রদায়িকতার জন্য সম্প্রদায় থেকে মুক্তি চাই। সম্প্রদায় মানুষকে খণ্ডিত করে। বিচ্ছিন্ন করে। প্রশ্ন হলো ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ কোন অংশের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করবো। আমি পূর্ণতার মধ্যে মুক্তি চাই নাকি খণ্ডের মধ্যে পূর্ণ হওয়ার বৃথা চেষ্টা করবো?

"ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, অন্তঃ ও বহিঃ। আভ্যন্তর অনুভূতিও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতির দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ণসত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে।···বহির্জগতের সত্যের

অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই আবার অন্তর্জগতের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই।" [পৃঃ ১৩/খ. ৩য়] লক্ষ্য করার মত কথা হলো আভ্যন্তর অনুভূতির দ্বারা সংগৃহীত সত্য সমূহের অন্যতম হলো ধর্ম। ধর্ম মানুষের অন্তর সত্যের একমাত্র অনুভূতি নয়। আবার কেবলমাত্র আভ্যন্তর অনুভূতি মানুষের একমাত্র মানসক্রিয়া নয়। অর্ধেকমাত্র। বিজ্ঞান অপর অর্ধেক। দুয়ে মিলে পূর্ণ মানুষ। এক সময় ধর্ম দর্শনের সহায়তা নিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। দর্শনও ধর্মের দাসত্ব করেছে। বিজ্ঞানকে দিয়ে ধর্ম এই কাজটা করাতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু বিজ্ঞানের চরিত্রই এই যে তার তত্ত্ব সর্বদাই ধর্ম বিরোধী হয়। ফলে ধর্ম-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব কিছুতেই যাবার নয়। স্বামীজী এদিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের সমর্থন চেয়েছেন অবশ্য অন্যকারণে। ধর্মের বিকৃতি পরিহার করার জন্য। কেননা, "ধর্ম সমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও ঐগুলি শুধু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে। এমন এক সময় আসিয়াছে যখন মানুষের চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে আমরা শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সম্পর্কে আসিয়াছি। সুতরাং জগতের ভাবী ধর্মসমূহকে যেমন সর্বজনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে হইবে।" [পৃঃ-১২৯ / খণ্ড-৩য়]

'সর্বজনীন' এবং 'উদার' হওয়ার যে আহ্বান স্বামীজী রেখেছেন এসম্বন্ধে মনোনিবেশের সময় এখন এসেছে। মানব সভ্যতা বিস্তারের দ্বারা এটা সম্ভব। স্বামীজী হয়তো বলতেন, "প্রাণের বিস্তার, চিন্তার বিস্তার। সমগ্র বিশ্বই হইতেছে বিস্তারের জন্য সংগ্রাম ও অন্য ভাষায় বলিতে গেলে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা। সেই নিম্নতম পর্যায়ের প্রাণীরাও বিস্তারের জন্য প্রয়াস করিতেছে এবং অনেকের মতে মানুষ নিজেই এই সকল প্রাণীর বিস্তার" [পৃঃ ২৯৬/খণ্ড ৩য়]

বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্তন এবং অভিব্যক্তিবাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। বৈচিত্র্যই তিনি চেয়েছেন। "অতএব আমাদের মূলমন্ত্র

হওয়া উচিত বর্জন নয়। মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—"কিছু নষ্ট করিও না। ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে পারে না। বরং গঠন কর। যদি পারো সাহায্য কর, যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর।" [পৃঃ-১৭৩ / খ-৩য়]

এই উদার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত মানুষ প্রচলিত ধর্মসংঘের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যাবে। ধর্ম সংঘের বাইরে আর কজনই বা আছেন। যারা আছেন তারাও নন তেমন সংগঠিত। ধর্মনীতি যারা প্রচার করেন, সেই বুদ্ধ বা চৈতন্য তো চিরদিনের নন। তাদের নীতি রক্ষার দায় বহণ করেন পুরোহিত সম্প্রদায়। মূল ধর্মনীতি প্রচারক থেকে এই পুরোহিত সম্প্রদায় যতদূরের হবেন ততই ধর্ম-ব্যবস্থায় সংস্কার বেড়ে যাবে। সেই সংস্কার রক্ষা করার জন্য নিয়ত প্রচেষ্টা এই পুরোহিতদের। বিবেকানন্দ বলেছেন, মুক্তির জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। সংস্কারের প্রয়োজন নাই। মানব সংস্কৃতি বহতা। তা রক্ষা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কাউকে পিছিয়ে যেতে দেওয়া চলবেনা। যে এগিয়ে আছে তাকেই হাত ধরে টেনে তুলতে হবে যে বা যারা পিছিয়ে আছে তাদের। তিনি এও বলেছেন, কার কী ধর্ম তাও বিচার-বিবেচনার বাইরে রাখতে হবে। মানুষ এই পরিচয়ে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। এই মহাযাত্রায় প্রত্যেকের অধিকার হলো প্রশ্ন করার এবং কারণ জানবার। কারণ জেনেই এগিয়ে চলছে সভ্যতা—বিজ্ঞান। বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক কিন্তু ধর্মীয় প্রভাময় নেতা। ধর্ম সংঘের মধ্য থেকেই তিনি চেয়েছিলেন ধর্ম বিপ্লব। তাঁর কথা, কাজ কর। ধর্ম কী? তিনি বলতেন বিকাশ হচ্ছে বস্তুর ধর্ম। নিজের

কাজটা সবচাইতে ভালো করে করা এবং সুষ্ঠুভাবে করাই ধর্ম। এই অর্থ গ্রহণ করলে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অপরকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসী মাত্রকেই ভাই বলে সম্বোধন করতেন।

বর্জন নয় গ্রহণের উপরই স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ওটাই মুক্তির পথ বলে স্বামীজী মনে করতেন। কিন্তু দুএকটি ক্ষেত্রে তিনি বর্জনের আহ্বানও শুনিয়েছেন। এটা যে মধুর হবেনা তাও তিনি জানতেন। বলেছেন "সত্য সকল সময় মধুর হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে তথাপি তা বলিতে হয়।" [পৃঃ ২৪ / খণ্ড-৬ষ্ঠ] বলার কথাটা কিঞ্চিত অপ্রিয় হতে পারে। কেননা, মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তিনি দেখেছিলেন ধর্মের একটি অংশের মধ্যে। 'এসো মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব। আগে তাদের নির্মূল কর। এস মানুষ হও।···পেছনে চেওনা—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেওনা, সামনে এগিয়ে যাও।" [পৃঃ-৩৫৯ / খ-৬ষ্ঠ]

সামনে এগিয়ে চলার পথে বাধাও ঐ ধর্মের মধ্যে দেখে বলেছেন, "যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক। সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য।" [পৃঃ-৪১৪ / খণ্ড ৬ষ্ঠ]

স্বামীজীর প্রশ্নের জবাব সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক এই দুই শক্তিকেই দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেকে পালটায় নি। অন্য পক্ষে অসাম্প্রদায়িক শক্তির যা করার কথা ছিল তারা তা করে নি। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারে নয়, তা প্রতিরোধ করার কাজ কতটা করেছেন অসম্প্রদায়িক শক্তি? বলার কথা এটাও যে, বিবেকানন্দ

ধর্মীয় শক্তিকে অসাম্প্রদায়িক হতে বললেও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করতে আহ্বান জানান নি। বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে ধর্ম সংঘ অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক শক্তি কী করবে? সে নির্দেশ পাওয়া যাবে অন্যত্র। সেই প্রসঙ্গ এবার আমাদের আলোচনার বিষয়।

স্বামীজীর রচনার উদ্ধৃতি উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দ রচনাবলী থেকে নেওয়া হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িকতা ঃ উপসংহার

সাম্প্রদায়িকতা একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার পরিণতি। বিশেষ করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। নানাভাবে এবং বিচিত্র পথে তা আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য হলো, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার শিকড় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা একটা স্থায়ীভাবের রূপ নিয়েছে। এই ভাব সংস্কৃতির মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে। মানব ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রভাব কতটা? এটা কি অবশ্য মান্য যে মানব সভ্যতাকে সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করতে হবে?

সমকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা তো সাম্প্রদায়িকতার বিকল্প শব্দরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। ভারতীয় জন-জীবন বৈচিত্র্যে ভরা। কেবলমাত্র ধর্মের বিভিন্নতাই এর কারণ নয়। বৈচিত্র্য আছে ভাষা, পোশাক, বিবাহ, বর্ণ, শ্রেণী, উদ্ভব, বিকাশ, প্রকৃতি এবং লোকাচারে। প্রধান ধর্মসমূহের কথাই যদি বলি তো দেখা যাবে হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং শিখ প্রভৃতি ধর্মের বহু-মানুষের বাস এই ভারতবর্ষে। বহু অপ্রধান ধর্মেরও বহুমানুষের বসবাস এই ভারতবর্ষে। সংখ্যার দিক থেকে হিন্দুরাই প্রধান। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোথাও হলেই মনে হয় হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত। হিন্দু-মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষ বাস করে এই ভারতে। এই জনসংখ্যাধিক্য দাঙ্গার একটি কারণ হতে পারে। ইংরেজ আমলে শিক্ষার অসম বিকাশের ফলে চাকুরীতে হিন্দুদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য গড়ে উঠে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিযোগীর সম্ভাবনা এবং মুসলমানদের দিক থেকে চাকুরী না-পাওয়ার ক্ষোভ থেকেও এই সম্প্রদায় বিরোধ

এসে থাকতে পারে। ভাষা বিদ্বেষও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম কারণ বলে মনে হতে পারে। উর্দু মুসলমানদের ভাষা বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। কেননা, মুসলমানগণ ভারতে প্রথম এসেছিল সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে। উভয়ে অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা আছে এবং তা এখনত প্রচলিত। অপর পক্ষে আরব ইরান কিংবা তুরস্ক, মুসলমানগণ যে স্থান থেকেই আসুক, তাদেরও ছিল নিজ নিজ ভাষা এবং এখনও তা প্রচলিত। উর্দু একটি নতুন ভাষা। এতে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রভাব এবং অবদান আছে। তথাপি উর্দুকে মুসলমানের ভাষা বলেই হিন্দুরা মনে করে। মুসলমানগণ অনুরূপ ভাবে সংস্কৃতকে হিন্দুদের আদি বা মূল ভাষা বলেই মানে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এও একটা কারণ।

হিন্দুমুসলমানের এই ভাষা বিরোধে ইংরেজদেরও ইন্ধন আছে। উর্দু তার জন্মলগ্নে হিন্দোভি বলে পরিচিত ছিল। প্রেমচাঁদ, কিষেণচাঁদ প্রভৃতি লেখক গণ উর্দুতেই লেখাশুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার উর্দুর জন্য মৌলবি এবং সংস্কৃতের জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করে এই বিরোধ স্থায়ীকরে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ক্রিয়া শুরু হয় পাঠশালা এবং মাদ্রাসা থেকে। প্রাথমিক পাঠক্রমের বই দেখলে যেকেউ এটা মানবেন। উভয় সম্প্রদায়ের পোশাক পরিচ্ছদেও দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। হিন্দু মহিলার শাড়ি-ব্লাউজের পাশে মুসলমানের সালোয়ার কামিজ। পুরুষের পোশাকেও আছে বৈপরীত্য। চুড়িদার পায়জামার সঙ্গে ধুতির ব্যবধান তো কম নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যকে বৈচিত্র বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মুখোমুখি হলেই তারা সচেতন হয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যাপারে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক পরিচয় বাহ্যিকভাবেই এত প্রকট যে, কোন অসাম্প্রদায়িক হিন্দু কিংবা মুসলমানেরও এই সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থেকে রেহাই নেই। ফলে, দাঙ্গা লাগলে পরিস্থিতি হয় ভয়াবহ। মুহূর্তের জন্যও এরা আত্মপরিচয় গোপন করতে পারে না। হয়তো অনেকেই ভাবেন এটা হওয়া

উচিত নয়। কিন্তু কৈশোর থেকে দুই বিপরীত সংস্কৃতি ও আচারে লালিত হয়ে এই গোলক ধাঁধা থেকে এরা বেরিয়ে যেতে পারে না।

এযেন মুখোমুখি দুটি দ্বীপ। কাছাকাছি অবস্থিত। কিন্তু মাঝে বয়ে যাওয়া লবণাক্ত সমুদ্রের দুরতিক্রম্য ব্যবধান। উভয়ের মিলনের ইচ্ছা নিয়ত ঝঞ্ঝাবাতে বিপর্যস্ত। কাছে আসতে না পারার জন্য অপরিচয় ক্রমেই বেড়ে উঠে। এই অপরিচয় থেকে আসে অবিশ্বাস। অবিশ্বাস থেকে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। অবশেষে দাঙ্গা। যদি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় সহজে হতে পারত, নিবিড় হতো সম্পর্ক, তাহলে এই বিদ্বেষ অনেকটাই এড়ানো যেত। এটা ঠিক যে, অর্থনৈতিক কারণে সংঘাত চলবেই। শোষিত জনতা শ্রেণীশত্রুকে চিনতে না পারার কারণেও দাঙ্গা হয়। শোষক নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ মিটতে দেবে না। দরিদ্রের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং চাকুরী না পাওয়ার কারণটাকে সে বিধর্মীর কারসাজি বলে চালিয়ে চলে। ভারতে এটা চলতে পারার একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে। ইংরেজরা যখন ভারত দখল করে তখন শাসক ছিল মুসলমানগণ। ইংরেজদের কাছে রাজশক্তি হারিয়ে তারা ইংরেজকে শত্রু ভাবে এবং ইংরেজি শিক্ষা পরিহার করে। হিন্দুরা দ্রুত ইংরেজি শিখে চাকুরীর বাজার অধিকার করে নেয়। মুসলমানগণ এটা হিন্দুদের ধর্মীয় চাতুরী বলে মনে করে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করুণ, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হয় না। কেননা তারা অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি ভাগ করে নিয়েছে। দরিদ্র জনতাকে এই সুযোগ দানে বঞ্চিত করার জন্য ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখা হয়। শোষিত মানুষ যদি এটা বোঝে যে, ধর্মের জন্য কেউ ধনী বা নির্ধন হয়না, তাহলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কমিয়ে আনা যাবে। দেখা দেবে মিলনের বাতাবরণ।

হিন্দু বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তারা ধর্মীয় দর্শনের দিক থেকে কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব। এছাড়াও হিন্দুদের আছে নানা উপবিভাগ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ইহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি

হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি?" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'হিন্দু' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: "হিব্রু ভাষায় ভারত-বর্ষের নাম হনদ…জেন্দভাষায় হিন্দব। গ্রীক ভাষায় হন্দকোশ, ইন্দিকোস্, ইণ্ডিওস। পস্তুভাষায় ভারতকে হনদ বলে সুতরাং হিন্দ্ এর অধিবাসী হিন্দু।…ব্যাপকার্থে সনাতনী, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম। [ভারতের বাহিরে ব্যাপকার্থে] মার্কিন প্রভৃতিদেশে হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারতের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু নামে আখ্যাত। শুনা যায়, ভারত হতে যে সকল মুসলমান আরব দেশে হজ করিতে যান, তাহাদিগকেও ঐ দেশের লোকেরা হিন্দু বলিয়া থাকে।" হিন্দু শব্দটিও উচ্চারণ বিভ্রাটের ফল। অথচ ঐ শব্দটিকে কেন্দ্র করেই আজ অযথা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ধর্ম হলো কোন অতিপ্রাকৃত বা পরাশক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাসের কেন্দ্রে এক বা একাধিক ব্যক্তি কিংবা কল্পিত ঈশ্বর থাকেন। যদিও বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। প্রত্যেক ধর্মই তাদের কল্পিত ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে প্রচার করে। ঈশ্বরের প্রতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকেই প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিবেদন করতে হয়। ধর্মসংঘের দ্বারা ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করা হয় কিন্তু তার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় না। ফলে কোন রকম প্রশ্ন করাও অনুগত্য হীনতার পরিচয় বলে বিবেচিত হয়।

প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়েরই ধর্ম পুস্তক থাকে। হিন্দুদের মূল ধর্ম পুস্তক বেদ। বেদের সংখ্যা চার। এই গ্রন্থ দুই কাণ্ডে বিভক্ত: ক্রিয়াকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। ক্রিয়াকাণ্ড আবার দুইভাগে বিভক্ত: ব্রাহ্মণ এবং সংহিতা। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ নামের পরিচিত। উপনিষদ বেদান্ত নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। উপনিষদকে শ্রুতিও বলা হয়। পুরাণকে বলে স্মৃতি। উপনিষদ, গীতা ও ব্যাসসূত্র একত্রে প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। মূলতঃ এই সকল গ্রন্থের নির্দেশিকা অবলম্বন করে

হিন্দু সম্প্রদায় চলে। বিবেকানন্দ মানব মুক্তির যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক বাণী প্রচার করেছেন তার উৎসে আছে উপনিষদ।

ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উদ্ভব। তাই ধর্মীয় দর্শন ও রীতি নীতিতে প্রকৃতির একটা ভূমিকা আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র বরুণ কিংবা সূর্য একারণেই দেবোপম মর্যাদা পায়। হিন্দুদের জীবনে সূর্যের প্রভাব সীমাহীন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, নানাভাবে সূর্য এসেছে হিন্দুদের আচারে। সূর্যোপাসনা এবং সূর্যবন্দনা হিন্দুদের পবিত্র কর্ম। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দিনের কাজ শুরু হয়। সূর্য অস্ত গেলে তবে বিশ্রাম। হিন্দু সংস্কৃতিতে সূর্যের প্রভাব কম নয়। কবিতা, গল্প, ইতিহাস ও সঙ্গীতে সূর্য এসেছে নানারূপে। ওড়িশার সূর্য মন্দির ভুবন-বিখ্যাত। হয়তো প্রচুর নদ-নদী এবং বৃষ্টির জন্য এই সূর্য নির্ভরতা। ভারতের কৃষিকাজেও সূর্যের প্রভাব সীমাহীন। হিন্দুদের বর্ষগণনা সূর্য-গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আলো আর উত্তাপ ছাড়া ভারতীয় জীবন অচল। রোদ চলে গেলে আসে রাত্রি। কর্ম-বিরতি। রাত-ভোর বিশ্রাম। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করে ভারতীয় শিশুর শৈশব। মধ্য গগণের সূর্যের তীব্র তেজ ভারতীয় যৌবনের প্রতীক। বৈকালিক তেজহীন রৌদ্র তার প্রৌঢ়ত্ব। সন্ধ্যার অস্তরাগ, ভারতীয় হিন্দুদের বানপ্রস্থের সঙ্গে তুলনীয়।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কোরআন। কোরআনের পরেই তারা মান্য করে হাদিসকে। ওঁরা বলেন, "কোরআন আল্লাকা কালাম হ্যায়" এবং "রসুলকে ফরমান কো হাদিস কহতে হ্যায়।" সে যাই হোক, জানার কথা হলো, কোরআন এবং তার সহায়করূপে হাদিসের নির্দেশে মুসলমানদের জীবন চালিত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকরী। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। প্রথমেই বলতে হয় ইসলামের পাঁচটি মূল নির্দেশের কথা। তা হলো—কলমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ এবং জাকোয়াত। নমাজ আদায়ের বিধান বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান ও জনক-জননীর দায়িত্ব এবং অধিকার নির্দিষ্ট করা আছে তাদের ধর্মগ্রন্থে। এক কথায়

বলা হয়, জীবন হলো খোদার দান এবং তা একটি পর্যটনের সঙ্গে তুলনীয়। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যার শুরু এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলে তার সমাপ্তি। মুসলমানদের মানসিকতা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, কোরআনের নির্দেশ মান্য করাকে তারা পরাধীনতা মনে করে না। মনে করে মুক্তির উপায়। অপর পক্ষে, একজন হিন্দু ধর্মীয় আচার পালন না করেও সে হিন্দু থাকতে পারে।

দুই সম্প্রদায় একে অপররের জীবন চর্চার এই তফাতটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারার এই সমস্যা থেকেও বহু বিরোধের সৃষ্টি হয়। ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা ধর্মের প্রতি আনুগত্যের কারণেও বিরোধ সৃষ্টি করেন। কোরআন নির্দেশিত পথে বিবাহ করেও কেন যে তা 'চুক্তি মাত্র, ধর্মীয় বন্ধন নয়,' এটা হিন্দুর বোধের অতীত। অপর পক্ষে 'ধর্মসাক্ষী' করে হিন্দুর বিবাহ যে কেন চুক্তিমাত্র নয় এটাও বোঝে না মুসলমানগণ। উভয় সম্প্রদায়ের কাছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের আছে নানা জিজ্ঞাসা ও বহু প্রশ্ন। উত্তরহীন এই প্রশ্ন থেকেই দেখা দেয় অভিযোগ। কেবলমাত্র পারস্পরিক যোগাযোগ ও মিলনের দ্বারা এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রায় একহাজার বছর ভারত উপমহাদেশে পাশাপাশি বসবাস করেও তারা সামাজিক যোগাযোগ এবং মিলনের পথ খুঁজে পায় নি। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে যোগাযোগ কিংবা মিলন হয়েছে কিন্তু সামাজিকভাবে তা প্রায় মূল্যহীন। কেননা, সামান্য যা কিছু মিলন হয়েছে তা গৃহের বাইরে। পরস্পরের গৃহে যাতায়াত প্রায় হয় না। ক'জন হিন্দু মুসলমানের এবং কজন মুসলমান হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান দেখেছে তা হাতে গোনা যায়। আশ্চর্য এই যে, এই অজ্ঞানতা সত্ত্বেও চলে বিরোধী পক্ষের সমালোচনা এবং বিরোধিতা। এই অন্ধ বিরোধিতা এতো যাওয়ার নয়। আমি যা জানিনা, তা যে ঠিক নয় এটা আমি জানি। একথা বলার পর যুক্তি প্রয়োগ তো অর্থহীন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধিতাও ধর্মের মতো বিশ্বাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তি প্রায়

নেই। এইখানে চাই যুক্তির প্রয়োগ এবং মেলামেশার খোলামেলা পরিবেশ।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। তিনি চল্লিশ বছর বয়সের সময় ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মাত্র ২৩ বছর তিনি ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলাম ধর্ম মিশর, সিরিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, গল, পারস্য এবং কাবুল উপত্যকা দখল করে নেয়। ঐ সকল দেশের প্রায় সকল অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাশিমের বাহিনীর কাছে সিন্ধুর রাজা দাহিরের পরাজয় থেকেই মুসলমানদের ভারত বিজয় শুরু। আরবগণ ভারত দখলের জন্য আর এগিয়ে আসেনি। কিন্তু আফগান, তুর্কী এবং মোঘলরা বার বার ভারত আক্রমণ করেছে। মুসলমানগণ শুধু যে ভারত দখল করলো তাই নয়, তারা ভারতকে তাদের দেশ বানিয়ে এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করলো। অনেক হিন্দু মুসলমান হলো ঠিকই কিন্তু বেশীরভাগ হিন্দুই তাদের ধর্ম ত্যাগ করলো না। যদিও মুসলমান বিজয়ের পর অন্য সব দেশের প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মের এই বিস্ময়কর জীবনী শক্তি স্মরণে রাখা দরকার। হিন্দুদের মনে মুসলমান আক্রমণের স্মৃতি এখনও অমলিন।

তৃতীয় কারণটি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। মুসলমান ধর্ম প্রচারে দুটি ধারা দেখা যায়। একটিকে বলা হয় "গাজীয়ানা তারিকা" এবং অন্যটি হলো, "সুফীয়ানা তারিকা।" ইসলাম ধর্ম প্রচারে অস্ত্রের একটা ভূমিকা ছিল। যারা অস্ত্রের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেন তাদেরই গাজী বলা হয়। এরা মনে করেন, এরা যে ধর্মযুদ্ধ করছেন তা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের জন্য। এরা ধর্ম প্রচারের জন্য বিজয় অথবা মৃত্যু দুটোই সমান কাম্য মনে করে। একারণেই প্রচলিত প্রবাদ হলো,

"যুদ্ধে মরে তো শহীদ জিতে তো গাজী।" ধর্ম যুদ্ধে বিজয়ী এই গাজী উপাধি পায়। গাজীদের দ্বারা যদি ভারতে ইসলামধর্ম প্রচার সফল হতো, তবে ভারতে এত হিন্দু থাকত না। আবার ভারতের রাজধানী কিংবা রাজসভার কেন্দ্রস্থল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, হায়দরাবাদে মুসলমানের সংখ্যা কম। অবিভক্ত বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় সকলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলো। এটা কেন হলো? এ বিষয়ে বিবেকানন্দের একটি উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে প্রজাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়া ছিল।...বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেই জন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।"

[পৃঃ-৩৫-৩৬ / খণ্ড-৭ম।]

অবিভক্তবঙ্গের পূর্বাংশে হিন্দু জমিদারের প্রাধান্য। আবার মুসলমান কৃষকও সেখানেই বেশী। এখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে, তরবারির ভয়ে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। হিন্দু উচ্চ বর্ণের অত্যাচারে অসংখ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এখনো দেখা যায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের স্পর্শ করেনা। তাদের উপর অন্যায় নির্যাতন চালিয়ে চলে। কিন্তু ঐ নিম্নবর্ণের কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে উচ্চ বর্ণের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়। এরা চেয়েছিল একটু সহানুভূতি, মর্যাদা আর অধিকার। ইসলাম এদের তা দিয়েছে।

ইসলামের গাজীদের কাছে নয়, এই সহানুভূতি এরা পেয়েছে সুফী মুসলমানদের কাছ থেকে। সুফীরা মুসলমানদেরই একটা অংশ। এরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিন্তু আপন ধর্ম বিশ্বাসকে অপরের উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা চাপিয়ে দিতে চায় না। এঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত

হতে চায়। যেমন চায় হিন্দু বৈষ্ণবেরা। এঁরা আত্মদানে সদা উৎসুক। দারিদ্র্যকে এরা ভূষণ মনে করে। এঁরা পার্থিব সম্পদে নয়, ধনী হতে চায় ঈশ্বর প্রেমে। এই ঈশ্বর প্রেম, পরমাত্মার সঙ্গে মিলন এবং আত্মত্যাগের যে বাণী, তার সঙ্গে গভীর মিল আছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। এদের মানবতাবাদী বলা যুক্তিযুক্ত। একারণে, এদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ আছে কট্টরপন্থী মোল্লাদেরও। জগৎ জুড়ে একটি জাতি, মানুষ জাতিতে এদের বিশ্বাস। এরা চায় সাম্প্রদায়িক মিলন। সাম্প্রদায়িক গণ্ডীবদ্ধতা এদের কাম্য নয়। ঈশ্বরকে এঁরা দেখতে পান বিশ্বের তাবৎ বস্তুতে। দেব-দেউলে এঁরা ঈশ্বরকে খোঁজেন না। ঈশ্বরের স্থান মানব মনে, তার প্রতি প্রেমে। তাই মানুষই এদের কাছে দেবতা।

সুফীদের জীবন ধারাও খুব সাদা সিধে। এরা লম্বা সাদা কুর্তা ব্যবহার করে, যা তৈরী হয় একরকমের মোটা উল দিয়ে। সুফ শব্দের অর্থই হলো উল। এই থেকেই সুফী শব্দটি এসেছে। এরা অস্ত্রব্যবহার করেনি। প্রেমের বাণী এদের অস্ত্র। ফলে, বলবানের কাছ থেকে এরা প্রভূত অত্যাচার সহ্য করেছে। নবম শতাব্দীতে শ্রদ্ধেয় সুফীনেতা, চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ সুফী মনসুর অলহাল্লাজকে প্রচণ্ড অত্যাচারের পর বাগদাদের রাজপথে হত্যা করা হয়। এরও প্রায় তিনশত বছর পরে দ্বাদশ শতকে, গাজালীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সুফী মতবাদ প্রচারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাপক গণ সমর্থন লাভ করে। সুফীদের কাছে দলে দলে নিম্ন বর্ণের মানুষ আত্মসমর্পণ করে। ভারতের গ্রামে গঞ্জে যে শত শত পীরের মাঝার আছে তা এই সুফী সন্তদের। গাজীদের নয়।

মিলনের এই আলোচনা আপাততঃ মুলতুবি রেখে আমরা আবার একটি বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করছি। হিন্দুদের কাছে সূর্যের যে স্থান, মুসলমানদের কাছে সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করে আছে চাঁদ। ভারতের জলীয় পরিবেশের জন্যই সম্ভবতঃ সূর্য ভারতবাসীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আরবের মরুবাসীদের কাছে সূর্য অসহনীয় তাপ সৃষ্টিকারী। সূর্য তেজে উত্তপ্ত বালুভূমিতে কাজ করা অসম্ভব। দিনে তাই আরব

বাসী আশ্রয় নেয় গৃহকোণে। সেটা তার বিশ্রামের সময়। আরব জাতির কর্মতৎপরতা শুরু হয় সূর্য ডোবার পর। চাঁদের আলোয়। পিরামিড দেখতে হলে আজও ভ্রমণকারীকে রাতে তা দেখানো হয়। মুঘলস্থাপত্যের চরমোৎকর্ষ যেখানে মূর্ত সেই তাজমহল ভারতে হলেও তাও উপভোগ করতে হয় চাঁদনী রাতে। চাঁদের মোহময় আলোয় জীবন-যাপনের ফলে তাদের কাব্যেও দেখা যায় প্রেমের মোহময় আহ্বান। রমজান মাসের রোজার খাওয়া হয় ঐ চাঁদের আলোয়। দিনে তার নির্জলা উপবাস। মুসলমানের বছরের হিসাব হয় চান্দ্র মাস দিয়ে। দেখা যাচ্ছে হিন্দু মুসলমানের দিন-যাপনে মিল অপেক্ষা অমিলই বেশি।

তাহলে কী করে এরা ভারতের মাটিতে হাজার বছর ধরে হেঁটে চলে চলে বেড়ায়? নিশ্চয়ই কোথাও আছে মিলনের সেতু। শুধু তো দাঙ্গাই হিন্দু মুসলমানের ইতিহাস নয়। মুসলমান সম্রাট হিন্দুমন্দির নির্মাণে সাহায্য করেছে। হিন্দুরমণী মুসলমান সাহেবজাদাকে রাখী বেঁধেছে। হিন্দু সেনাপতি জীবনপণ করে মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের সূর্য নির্ভরতা কিংবা প্রকৃতি নির্ভরতা অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় বলে এখন মনে হয়। আবার হাজার বছর ভারতে বসবাস করার ফলে মুসলমানদের কাছে আজ আর চাঁদ তত জরুরী নয়। দিনের কাজে তারা অনেক সাবলীল। আজকের ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে ধর্মীয় কারণে চাঁদের প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত কারণে তা নেই। পদতলে তপ্তবালুকা ভারতীয় মুসলমানকে আজ আর দগ্ধ করে না।

ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলনের তিনটি উৎস দেখা যায়। প্রথমতঃ বহু মুসলমান শাসকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী: যেমন আকবর বাদশাহ। দ্বিতীয়তঃ একই প্রাকৃতিক পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানজাত মিলন। ভাষা এই মিলনের অন্যতম বাহন। যেমন বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা বাংলা। উত্তর ভারতে হিন্দী-উর্দু। তৃতীয়তঃ সুফী মতবাদের প্রভাব।

সুফী মতবাদ নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। মিলিত উপাসনার কথা কিছু উল্লেখ করছি এবার। বাঙলায় মুসলমানের সত্যপীর হিন্দুর সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণের পুজানুষ্ঠানে প্রসাদ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বলা হয় শিরনি। শিরনি বা পূর্ব বাঙলার সিন্নি তৈরী করতে হয় কাঁচা দুধ, কলা, আটা, ফলের টুকরো ও নারকেলের জল দিয়ে। শিরনি শব্দের সঙ্গে আশ্চর্য ধ্বনি সামঞ্জস্য আছে মুসলমানদের মিষ্টি খাদ্য ফিরনির। দ্বিতীয় মিল দেখা যায় পারসিয়ান শব্দ 'শির'-এর সঙ্গে। শির মানে দুধ। শিরনি হয় কাঁচাদুধ দিয়ে। হিন্দু মুসলমানের অভিন্ন উপাস্য দেবকল্পচরিত্র 'বনবিবি'। মানিক পীরও উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য।

হিন্দু মুসলমান মিলনের একটা মিলনক্ষেত্র পাওয়া গেল সুফী মতবাদের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহারের এটা একটা উৎসস্থল হতে পারে। যদিও একে স্থায়ী প্রতিকারের পন্থা বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গ আবার আলোচনায় আসবে।

সাম্প্রদায়িকতা পরিহারের প্রয়োজনীয়তা কেন এবং কতটা? সাম্প্রদায়িকতার ফলে জাতির আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক শক্তির ক্ষয় হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করার সহজ পথ হলো জনসংখ্যার রূপটা দেখা। ভারতের জনসংখ্যার প্রতিহাজারে ৮৪০ জন হিন্দু, ১০২ জন মুসলমান, ২৪ জন খ্রীষ্টান, ১৮ জন শিখ এবং ৮ জন বৌদ্ধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাকীরা। ৮০ কোটির উপর লোক সংখ্যা যুক্ত এই দেশে এই বিভাগ প্রতি ক্ষেত্রেই কোটি কোটি। এত মানুষকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখলে তাদের ভার বহন করবে কে? আবার তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করলে যদি দাঙ্গা হয় তবে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিহীন হবে। কোন সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার মাধ্যমে এদেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা অসহযোগিতা কিংবা অবিশ্বাস দেশের সর্বত্র কর্মগতি শ্লথ করে দেবেই। দেশের নিরাপত্তার জন্যও এই বিরোধ মেটাতে হবে।

আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা বহিঃশক্রকে প্রলুব্ধ করতে পারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দরকার।

অপর পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মিলিত শক্তি ভারতের অগ্রগতি সহজ করবে। ভারতীয় জনজীবনে বৈচিত্র্য আসবে। মিলিত কর্মদ্যোগ সৃষ্টি করবে বিপুল সম্ভাবনা। বিশ্বে ভারত হবে অপরাজেয়। স্বামীজীর একটি চিঠির উল্লেখ করছি। ১৮৯৮ সালের ১০ই জুন, স্বামীজী আলমোড়া থেকে নৈনিতালের মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে এই চিঠিখানি লেখেন। পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ—

"পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এইযে, কখনো যদি কোন ধর্মের লোক দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ—বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।"

[পৃঃ ৩৮ খণ্ড / ৮ম]

এই উদার আহ্বানে প্রত্যাশিত সাড়া মিলবে এমন ভাবনা সঙ্গত হবে না। ধর্ম প্রচারে দুটি বিভাগ দেখা যায়। প্রথম যিনি ধর্ম প্রচার করেন। যেমন গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রীষ্ট, হজরৎমহম্মদ এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এঁদের উদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা মুক্তির আকাঙ্খায় সমবেত হন তারা তো চিরদিন এদের ধরে রাখতে পারেন না। ফলে আসে দ্বিতীয় দল। যাঁদের আমরা বলি পুরোহিত। এরা ধর্ম সম্প্রদায় গঠন করেন। এরা সম্প্রদায়ের একটি নাম দেন। স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম' এক তবে 'সম্প্রদায়' অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলো, তখন

ইহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তখন আর উহা 'ধর্ম' থাকেনা ; সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই প্রচার করে। ঘোষণা করিতে ছাড়েনা যে, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' বিশ্বাস করে যে, জগতে একটি মাত্র ধর্মই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। দুইটি ধর্ম কখনো ছিল না"। [পৃঃ ২৯১ খণ্ড-৮ম] ইসলাম ধর্মেও এই কথাই বলা হয়। "সর্বকালের জটিলতর মানবীয় সমস্যাবলী সমাধানের জন্য এক ও অভিন্ন খোদার কাছ থেকে শুধু একটি মাত্র ধর্মই এসেছে" (ইসলামের রূপ-রেখা-পৃঃ ৭) কিন্তু প্রধান ধর্ম-প্রচারকগণ তো নশ্বর দেহের অধিকারী। একারণে মহাপুরুষদের প্রচারিত বাণী রক্ষার দায় নেন অন্য একটি শ্রেণী। এদের আমরা দ্বিতীয় বিভাগ বলছি। এরা ধর্মের একটি নাম দিয়ে তাকে সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত করে আচার-আচরণ ঠিককরে দেয় ; সেই সম্প্রদায়ের সকলের জন্য। এই পর্যায়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতা।

মনে হতে পারে সাম্প্রদায়িকতা পরিহারের জন্য অবশেষে আমাদের ধর্মের উপরই নির্ভর করতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে এ আলোচনা অর্থহীন। সামন্ত প্রথা বিরোধিতায় অনেক সামন্ত অংশ গ্রহণ করেছেন। তাতে সামন্তবাদ নূতন আকার পেয়েছে মাত্র বিলুপ্ত হয় নি। প্রয়োজন হয়েছে বুর্জোয়া বিপ্লবের। বুর্জোয়া বিপ্লব সামন্তপ্রথা ধ্বংস করেছে। আবার বহু বুর্জোয়া কোন একটা যুগের প্রেক্ষিতে হয়তো প্রগতি মূলক আন্দোলন করেছে। তাতে সাধারণ মানুষের কিছু সুবিধাও হয়েছে কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা উঠে যায় নি। সামাজিক ব্যবস্থার কিছু রূপান্তর হয়েছে মাত্র। গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচয় দিতে চাইছে। এর দ্বারা স্বামীজীরকথাই সত্যবলে প্রমাণিত হচ্ছে। সম্প্রদায় নামকরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হয়। প্রোটেস্টাণ্ট আন্দোলন সেকালের প্রেক্ষিতে ছিল প্রতিবাদী আন্দোলন। কিন্তু একালে তাও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। উদার ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা মানুষের কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা হতে

পারে। যেমন বুদ্ধদেবের আন্দোলনের ফলে হয়েছিল। কিন্তু তাও আজ একটি সম্প্রদায়। বুর্জোয় শক্তির পরিবর্তনের জন্য যেমন সাম্যবাদী প্রতিবাদ অপরিহার্য তেমনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি পেতেও চাই সাম্যবাদী প্রতিবাদ। কোন উদার মানবতাবাদী কিংবা অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক তাৎক্ষনিক কিছু সুবিধা দিলেও তা স্থায়ী প্রতিকার নয়। কেননা, এদের প্রতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিবাদ নেই আছে উপেক্ষা। কিন্তু বস্তুবাদীদের প্রতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদ প্রতি-রোধের রূপনিয়েছে। কেন না এরা জানে সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিহ্ন করার কাজটা বস্তুবাদীদের কাছ থেকেই আসবে।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ নির্ণয়ে এবং বিরোধীতায় বিবেকানন্দ ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর বিরোধিতা ছিল যুক্তিনিষ্ঠ এবং দর্শন ভিত্তিক। পুরোহিত শ্রেণীর স্বরূপ উদঘাটনে তিনি ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা। পুরোহিত সম্প্রদায় কখনো পাল্টাবেনা বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর নির্দেশিত পথে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার কাজ শুরু করা যায় এবং বহুদূর যাওয়া যায়। একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনও নিজেকে হিন্দু ধর্মের বাইরে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রূপে পরিচিতি চাইছে।

তাই বস্তুবাদীদের দায় এক্ষেত্রে সর্বাধিক। তাদের কাজটা একলা চলোর পর্যায়ের। এইকথাটা মনে রাখতে হবে, পুরোহিত শ্রেণীর পরিবর্তন হবে না। এদের বিরুদ্ধে প্রচার এবং প্রতিবাদ চাই নিরন্তর। তার জন্য চাই যুক্তি, দর্শন এবং কর্ম নিষ্ঠা। সেটা আছে বস্তুবাদীদের। বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করে দুনিয়ায় শ্রেণীমাত্র দুটি শোষক এবং শোষিত। তারা এও বিশ্বাস করে শোষকের স্থান থাকবেনা নতুন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায়। তাই সেই সমাজে কোন সম্প্রদায়ও থাকবে না। তারা এও বিশ্বাস করে তাদের আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের কাজটাও নিজেদেরই করতে হবে। যেহেতু আমরা সাম্প্রদায়িকতার উৎস নির্দেশ

করতে পেরেছি, তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিরোধ থাকলেও, এবং তা প্রতিহত করা কঠিন হলেও অবাস্তব কিংবা অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বস্তুবাদীরা 'ধর্ম' সম্বন্ধে তাদের মতামত স্পষ্ট করেই বলে। তারা এও বলে, ধর্ম বিশ্বাস এবং অসাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ এবং ভূমিকাও তাদের কাছে স্পষ্ট। কার্ল মার্কস বলেছেন, "ধর্মীয় দুঃখকষ্ট হচ্ছে একদিকে প্রকৃত দুঃখকষ্টেরই প্রকাশ, অন্যদিকে সেই বাস্তব দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বটে। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন দুনিয়ার করুণার কথা এবং ভৌতিক জীবনে আত্মার মোহ হচ্ছে ধর্ম। মানুষের জীবনে ধর্ম হচ্ছে আফিম।"

এই আফিম শাসক সম্প্রদায় সব সময়েই সাধারণ মানুষকে শাসন এবং শোষণ করার জন্য ব্যবহার করেছে। একদিকে ধর্মের নামে তাদের ইহলোক বিমুখ করে তুলেছে এই বলে যে, 'এই কথা ভুলো না এবং এই কথা বলেই পরস্পরকে সান্ত্বনা দিও যে, স্বর্গে তোমাদের জন্য স্থায়ী আনন্দের জীবন অপেক্ষা করছে।" এই কথাই প্রচার করা হতো ধর্মের নামে যে, ইহলোকে সাধারণ মানুষের চাইবার কিছু নেই। এজন্যই ধর্ম তাদের বলতে অভ্যস্ত করতো যে, "হে ঈশ্বর আমাদের এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন রাজার প্রতি ভক্তি রেখে......তোমার সেবা করতে পারি।" এত করেও বিদ্রোহ প্রতিরোধ করা যায় নি। যখনি কৃষক কিংবা শ্রমিক বিদ্রোহ হয়েছে তা দমন করেছে, "বিচার জেল দারোগা ও ফাঁসির জল্লাদেরা, গীর্জার মহামান্য প্রধান পুরোহিতেরা তাদেরই আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের হাতিয়ার হিসেবেই ধর্ম সবসময় ব্যবহৃত হয়েছে।"

ধনীকে নিরাপদ রাখার জন্যই ধর্মের বিকাশ। কেননা, শ্রেণী পূর্ব সমাজে যেখানে ধনী ছিলনা সেখানে ধর্মও ছিল না। "সম্পত্তিই সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে। সমস্ত যুদ্ধ রক্তপাত ও দ্বন্দ্বের মূলেই এই সম্পত্তি। আবার যেদিন এই পৃথিবী

সকলের সাধারণ ধনভাণ্ডারে পরিণত হবে—তা একদিন হবেই—সেদিনই দুনিয়া জোড়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে।” ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হলো শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন সমাজ কায়েমের সংগ্রাম। যেহেতু আদিম সাম্যবাদী সমাজে ধর্ম ছিল না তাই ভবিষ্যত সাম্যবাদী সমাজেও ধর্ম থাকবেনা। সাম্প্রদায়িকতা প্রতি বিধানের এটাই পথ। শ্রেণী থাকবে ধর্ম থাকবে, সম্প্রদায় থাকবে অথচ সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না, এ হতে পারে না। অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মপূর্ব সমাজে ছিলনা। সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে হলেও তেমনি সমাজ ব্যবস্থা চাই। নানাভাবে, সংস্কার করে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ কিছুটা কমিয়ে আনা যায় কিন্তু তা নির্মূল করা যায় না। বস্তুবাদ নির্দেশিত সামাজিক রূপরেখা মানলেই এটা সম্ভব হবে।

এই প্রবন্ধ রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে জর্জ টমসনের ধর্ম ও সমাজ প্রবন্ধের।

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে যে সকল বই ও লেখকের উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়াও যেসকল বই ও প্রবন্ধ এই গ্রন্থকারের সহায়ক হয়েছে তার তালিকা এই গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হলো।

১. ভারতবর্ষের ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ—বিপানচন্দ্র

৩. ইতিহাস অনুসন্ধান—গৌতম চট্টোপাধ্যায়

৪. মানব সমাজ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৫ ধর্ম ও কুসংস্কার—সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

৬. খাদ্য ও স্বাস্থ্য—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী

৭. খাদ্য বিশ্লেষণ—বীরেশচন্দ্র গুহ ও কাশীচরণ সাহা

৮. খাদ্য কথা—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৯. চর্যাগীতির ভূমিকা—জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী

১০. চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু

১১. চর্যাগীতিকা—সৈয়দ আলী আহসান

১২. বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৩. বিশ্ববিবেক সারক প্রবন্ধ—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

১৪. বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা—অমিয় কুমার মজুমদার

১৫. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৬. ভারতে বিবাহের ইতিহাস—অতুলসুর

১৭. Hindu law of marriage and Stridhana G Banerjee.

১৮. Law of marriage—H. K. Saharat

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	আছে	হবে
১০	৮	প্রমোদ কুমার	প্রামোদ কুমার
১২	১১	নির্জন	নিধন
১৬	১৩	সাম্প্রদায়িকতা	সাম্প্রদায়িকতাবাদী
১৮	৭	থেকে	লোক
১৯	১০	তাতে	তাও
২০	৪	মাল্য	মান্য
ঐ	ঐ	সমাজদলিতা	শব্দটি বাদ যাবে।
২০-২১	২২ / ২৩ / ২৫	নিমরোড়	নিমরোড।
২১	১৫	হয়	হয়না
২৭	১ / ৫ / ৬	খালি	ঘালি
২৭	৭	হায়দরাব	হায়দরাবি।